বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মিনি সায়েন্স ফিকশন

সৃজনী ভাষান্তর

সম্পাদনা : রণেন ঘোষ

পার্থিব
প্রকাশন

রাখে হরি মারে কে – আইজাক আসিমভ

মন্টি স্টেইন যে চতুরতার সঙ্গে জালিয়াতি করেছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। চুরির ফল হল এক লক্ষ ডলার। মন্টি স্টেইন নিজেও জানত যে, বিধিবদ্ধ সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরে সে ধরা পড়বেই।

কিন্তু যেভাবে সে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছে তা শুধুমাত্র অভূতপূর্বই নয়, এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। তাই স্টেট অব নিউইয়র্ক বনাম মন্টগোমারি হার্লো স্টেইন কেসটি চিরস্মরণীয়। আর এই কেসের পরই ফোর্থ ডায়মেনশনের আইনটির প্রণয়ন হয়।

আপনারাই মনে করে দেখুন না, কী করেছিল জালিয়াতটা? জালিয়াতি করে এক লক্ষ ডলারেরও বেশি হাতিয়ে নেয়ার পরে সে খুব ঠান্ডা মাথায় টাইম মেশিনে ঢুকে পড়ে। আর টাইম মেশিনটাও কিন্তু ওর নিজের ছিল না। ছিল অসদুপায়ে জোগাড় করা। কিন্তু এর পরের কাজ ছিল খুব ছোট-টাইম কন্ট্রোলের ডায়ালটা সে সাত বছর একদিন ভবিষ্যতে বেঁধে দেয়।

স্টেইনের উকিল ছিলেন খুবই উঁদে। তাঁর বক্তব্য ছিল খুবই পরিষ্কার। মহাকাশের গভীরে আত্মগোপন করা আর সময়ের বুকে লুকিয়ে থাকার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। এই সময়ের মধ্যেই অপরাধীকে খুঁজে বার করে শাস্তি দিতে হবে, এটাই হল আইনরক্ষক সরকারের কাজ।

সরকারি উকিলের যুক্তিও ছিল বেশ ধারালো। তাঁর মতে স্ট্যাটিউট অব লিমিটেশান বা বিধিবদ্ধ সময়সীমা নিয়ে চোর-পুলিশ খেলা অনুচিত। ধরা পড়ার যে ভয়, সেই ভয়, শঙ্কা, মানসিক যন্ত্রণা যাতে চিরদিন

ভোগ করতে না হয় সেই জন্যেই এই সময়সীমা বেঁধে দেওয়া। এক কথায় অপরাধীকে অনুকম্পা প্রদর্শন। নির্দিষ্ট কিছু অপরাধের সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার অর্থই হল, হয় সময়ের মধ্যে অপরাধী ধরা পড়বে, নচেৎ এই সময়সীমার মধ্যে সে যে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করবে তাতেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে। কিন্তু স্টেইন তো এই সময়ের মধ্যে কোনও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেনি!

কিন্তু স্টেইনের উকিল পাহাড়ের মতো অনড়। অপরাধীর মানসিক যন্ত্রণা বা ভয় মাপার কোনও কথাই আইনে নেই। শুধু সময়সীমা বেঁধে দেওয়া আছে।

সরকারি উকিল বললেন, সময় বেঁধে দেওয়ার ব্যাপারটা স্টেইনের বেলায় প্রযোজ্য হয় না।

সরকারি উকিলের আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে স্টেইনের বার্থ সার্টিফিকেট জমা দেওয়া হল। দেখা গেল স্টেইনের জন্ম হল ২৯৭৩ সালে। আর ৩০০৪ সালে সে অপরাধ করে। তখন তার বয়স ছিল ৩১ বছর। এখন ৩০১১ সাল... স্টেইনের বয়স এখন ৩৮ বছর।

তৎক্ষণাৎ চিৎকার করে উঠলেন সরকারি উকিল সর্বৈব মিথ্যা... ফিজিয়োলজিকালি স্টেইনের বয়স ৩৮ বছর নয়... মাত্র ৩১ বছর।

প্রতিবাদী পক্ষও থেমে থাকার পাত্র নয়– আমার অভিজ্ঞ বন্ধুকে আইনের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিই। আইনের চোখে ক্রনোলজিকাল অর্থাৎ কাল পরম্পরার বয়সটাই একমাত্র গণ্য বিষয়। আর এই বয়স নির্ণয়ের সহজতম পদ্ধতি হল আজকের দিন-তারিখ থেকে জন্ম-বছরটা বাদ দেওয়া।

সরকারি উকিল ক্ষেপে উঠলেন। তারস্বরে বলে উঠলেন– মাই লর্ড, স্টেইন যদি ছাড়া পায়, তাহলে আইনের অর্ধেক ধারাই অকেজো হয়ে যাবে। তাই আইনের রক্ষক হিসাবে...

খুব সুন্দর প্রোপোজাল। আইন পালটান... কালোপযোগী আইন প্রবর্তন করুন... সময়-ভ্রমণও তাতে অন্তর্ভুক্ত হোক। কিন্তু পরিবর্তিত আইন হওয়ার পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত বর্তমান আইনেই তো বিচার হবে।

বিচারক নেভিল প্রেস্টন রায় দেবার জন্যে পুরো সাতদিন সময় নিলেন। তারপর নির্দিষ্ট দিনে রায় দিলেন। আর এই রায়টাই আইনের ইতিহাসে এক নূতন যুগের সূচনা করল। অনেকেই অবশ্য বিচারককে পক্ষপাতদুষ্ট বললেন। বললেন, বিচারক মানবিক দিকটাই বড় করে দেখেছেন আর অল্প কথায় রায় দিয়ে নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করেছেন।

মাত্র একটি লাইনে কয়েকটি কথায় বিচারকের রায়—

"সময়ের বুকে লুকিয়ে স্টেইন বেঁচে গেল।"

ভবিষ্যৎ – ডব্লিউ হিল্টন ইয়ং

ভবিষ্যৎ-যাত্রার আগেই উইলিয়াম একটা ক্যামেরা আর টেপরেকর্ডার কিনে এনেছিল। আর নিজেও শর্টহ্যান্ড লেখায় অভ্যস্ত হল। যাত্রার রাতে আমরা সবাই জড়ো হলাম... সব আয়োজন সম্পূর্ণ। কফির কাপও এক সময়ে শূন্য হয়ে গেল। তখন আমরা গ্লাসে ব্র্যান্ডি ঢেলে পরস্পরকে শুভেচ্ছা এবং যাত্রাপথের মঙ্গল কামনা করলাম। নির্বিঘ্নে নিরাপদে প্রত্যাবর্তনও কামনা করলাম।

অবশেষে বললাম–গুড বাই। বেশিক্ষণ থেকো না কিন্তু।

–কী যে বলো। তাড়াতাড়ি ফিরব। আমাকে আশ্বস্ত করে মৃদু হেসে বলল উইলিয়াম।

আমি উদ্বিগ্ন নয়নে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। চক্ষের নিমেষে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। ভাবলাম ভবিষ্যতের বুকে ভালোভাবেই নেমেছে উইলিয়াম। ভাবতে না ভাবতেই দেখি আমার সামনে উইলিয়াম আবির্ভূত হল... আবছা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে রক্তমাংসে গড়া উইলিয়ামে পরিণত হল। কোনও পরিবর্তন নেই কোথাও। মনে হয়েছিল কত বছর কাটিয়ে যে ও ঘরে ফিরবে কে জানে।

বললাম–চলে এলে! হয়ে গেল?

বলল, আসব না তো থাকব নাকি! কফি আছে নাকি? বেশ বড় এক কাপ কফি দাও।

নিঃশব্দে কফি ঢালোম। অধৈর্য মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলাম না। কফির কাপটা এগিয়ে দিয়েই প্রশ্ন করলাম–চুপ কেন? ভবিষ্যতের কথা বলো।

–ব্যাপারটা কী জানো... আমি কিছুই মনে করতে পারছি না।

–সে কী! কিছুই মনে করতে পারছ না? কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবল সে। তারপর নিস্পৃহভাবে বলল–বিশ্বাস করো... কোনও কিছুই স্মরণে আসছে না।

–নোটবই কী হল? ক্যামেরা? টেপ রেকর্ডার?

–নোটবই ফাঁকা। ক্যামেরার শাটার বন্ধ। কেন জানি না টেপ রেকর্ডার শূন্য। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। চিৎকার করে বললাম–হ্যায় ভগবান, এমনটা হল কেন? কোথায় ভুল হল? তোমারই বা কিছু মনে পড়ছে না কেন?

–কেবল একটা কথাই মনে পড়ছে।

–কী... কী কথা?

–আমাকে সব দেখাল... সব প্রশ্নেরও উত্তর দিল। আমি সব বুঝলাম। তারপর আমাকে বলল, যে ভবিষ্যৎ না জানাই মঙ্গল। ভবিষ্যতের সব জানা হয়ে গেলে... বর্তমানে আর কেউ কোনও কিছু চেষ্টা করবে না।... আর সভ্যতার উন্নতিও হবে না। তাই...

–কী সব বকছ পাগলের মতো?

–না না পাগলামি নয়। ওরা আরও বলল যে, সব কেন-র উত্তর সহজলভ্য হলে বর্তমানের অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যাবে... 'কেন' আর 'কী'র উত্তর আমাদেরই মাথা খাঁটিয়ে বার করতে হবে। আর সেই জন্যে...

আমাদের মুখ দিয়ে আর কথা সরে না।

গণিতজ্ঞ – আর্থার ফেল্ডম্যান

ওরা তখন বাগানে। নয় বছরের কন্যাকে ডাক দিয়ে জেনিয়া হকিন্স বললেন–দুষ্টুমি করে না জো... হুড়োহুড়ি না করে বাবার কাছে এসে বসো... বাবা কত মিষ্টি গল্প জানে।

দুই গাছের ডালে বাঁধা হ্যামকে এসে বসল জো। বাপি... ও বাপি... সত্যি গল্প? বলো না বাপি... সত্যি?

–হ্যাঁ গো হ্যাঁ, যেমনটি ঘটেছিল ঠিক তেমনটিই বলছি। কন্যার গাল টিপে সস্নেহে বললেন ড্রেক হকিন্স।

হ্যামকের মধ্যে বাবার কাছে ঘন হয়ে বসল জো।

–আজ থেকে ঠিক দু'হাজার এগারো বছর আগে ডগস্টার-এর সিরিয়াস গ্রহের বাসিন্দারা পৃথিবী আক্রমণ করে।

--বাব্বাঃ... কী নাম! ডগস্টার! ওঁরা দেখতে কেমন ছিল বাবা?

তা প্রায় মানুষের মতোই.. মানুষের সঙ্গে খুবই মিল ছিল। ওদেরও দুটো হাত, দুটো পা, দুটো চোখ এবং অন্যান্য সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গও মানুষেরই মতো।

–বুঝলাম... কিন্তু সত্যি কি কোনও তফাৎ ছিল না? বিজ্ঞজনের মতো প্রশ্ন করল কন্যা।

–নিশ্চয় প্রভেদ ছিল... আগন্তুকদের প্রত্যেকের দুটো করে সবুজ ডানা ছিল। দুই কাঁধের পাশ দিয়ে সবুজ পালক-এ ঢাকা বড় বড় দুই ডানা, আর ছিল রক্ত লাল লম্বা এক লেজ।

–লেজও ছিল? আচ্ছা বাপি, ওরা কতজন এসেছিল?

–ত্রিশ লক্ষ একচল্লিশজন ছিল বয়স্ক পুরুষ, আর তিনজন মাত্র মহিলা। সার্দিনিয়া দ্বীপে ওরা সর্বপ্রথম পদার্পণ করে। আর পাঁচ সপ্তাহের মধ্যেই ওরা সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়ে বসল।

–পৃথিবীর লোকেরা বাধা দেয়নি? যুদ্ধ করেনি?

–করেনি আবার! গুলি-গোলা, অ্যাটম বোমা, গ্যাস, আরও কত কী সব মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল!

--ওগুলো কী বাবা... অস্ত্র জিনিসটাই বা কেমন?

--ওহো... বুঝতে পারছ না বুঝি? না পারারই কথা। অস্ত্রশস্ত্র যে সব সেকেলে হয়ে গেছে... তাও অনেক অনেক বছর হয়ে গেল। শত্রুদের মারার জন্যে ভয়ঙ্কর সব হাতিয়ার ব্যবহার হত। বহুকাল হল অস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেছে মামনি। উঃ, কী সব যুগ গেছে! শুনলেও গা শিউরে ওঠে! রক্ত, হত্যার নেশায় মানুষ সে যুগে পাগল হয়ে গেছিল! সে। যুগের কথা স্মরণ করে মনে মনে শিউরে উঠলেন ড্রেক।

–বুঝলাম! সে যুগে এখনকার মতো বুদ্ধির লড়াই হত না... তাই না বাপি? বড় বড় চোখ করে বলে জো।

--ঠিক বলেছ মামনি... সে যুগে মানুষেরা বন্দুক দিয়ে লড়াই করত... বুদ্ধির ব্যবহার জানতই না। যাক সে সব কথা... আক্রমণকারী ভিনগ্রহীরা কিন্তু অজেয় ছিল... কোনও অস্ত্রেই ওদের নিধন করা গেল না।

–তারপর?

--এরপর মানুষেরা মারাত্মক গ্যাস আর জীবাণুযুদ্ধ শুরু করল।

–জীবাণু? সে আবার কী বাপি?

–খুবই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীব... খালি চোখে দেখা যায় না... মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে হয়। আগন্তুকদের শরীরে সেই সব রোগজীবাণু ইঞ্জেকশন করে ঢুকিয়ে দেওয়া হল... তাতেও ওদের কিছুই হল না....

–উরি বাব্বা, তারপর... তারপর?

–সমস্ত পৃথিবী ওরা দখল করে নিল... পৃথিবীটা মানুষের হাতছাড়া হয়ে গেল। তুমি তো জানোই মামনি, এই নবাগতরা অঙ্কে খুবই পারদর্শী ছিল... আর তেমনি ছিল ওদের বুদ্ধি... মানুষ ওদের ধারেকাছে আসতে পারত না। এক কথায় বলা যায় ভিনগ্রহী আক্রমণকারীরা গোটা মিল্কিওয়ে মানে আকাশগঙ্গার মধ্যে শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ছিল। সংখ্যা নিয়েই ওদের খেলা... সংখ্যার সাহায্যে ওরা অসম্ভবকে সম্ভব করেছিল।

--তারপর কী হল বাপি? পৃথিবীর সব লোকগুলোকে কি ওরা মেরে ফেলল?

–না, ঠিক তা নয়, তবে অসংখ্য মানুষকে ওরা হত্যা করেছিল। আর অবশিষ্টদের ওদের প্রয়োজনে কাজে লাগিয়ে দিল। মানুষ একরকম দাসত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল।

তুমি তো জানো মামনি, সেই আদ্যিকালে মানুষ যেমন করে গোরু-ঘোড়া-ছাগল পুষত... ঠিক তেমনিভাবে ভিনগ্রহীরাও মানুষকে পোষ মানিয়ে আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত করেছিল।

অবশিষ্ট মানুষকে ওরা হত্যা করে খাদ্যে রূপান্তরিত করেছিল।

–বাপি, ভিনগ্রহীরা কোন ভাষায় কথা বলত?

--খুব... খুবই সাধারণ ভাষা... কিন্তু মানুষরা কোনওদিনও সেই ভাষা আয়ত্ত করতে পারল না। নবাগতরা কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই পৃথিবীর সব ভাষাই শিখে ফেলল।

–পৃথিবীর মানুষরা কী নামে ডাকত ওদের বাপি?

–সে এক মজার নাম দিয়েছিল। অ্যানভিল। বর্তমানে অপ্রচলিত ইংরাজি ভাষায় এর অর্থ হল, অর্ধেক-দেবতা অর্ধেক-শয়তান।

–তাহলে বাপি, মানুষ দাসত্ব মেনে নেবার পরে নিশ্চয় পৃথিবীতে শান্তি নেমে এসেছিল?

–তা এসেছিল। তবে সেই শান্তি বেশিদিন টিকল না দাসত্ব স্বীকার করার পরেও একজন সাহসী মানুষ বিদ্রোহ ঘোষণা করল... গ্রীনল্যান্ডের অভ্যন্তরে সে লুকিয়ে রইল। সে হল নোওয়াল। সাহসী এই নোওয়াল ছিল একজন প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ।

–মনস্তত্ত্ববিদ! সে আবার কী?

--যারা মনের কথা পড়তে পারে... নতুন ভাবনার জন্ম দেয়... মনের অসুখ ভালো করে দেয়... এরপর কী হল জানো... এই নোওয়ালই এক মুক্তির পথ বাতলাল... পৃথিবীকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখল।

–কিন্তু কেমন করে বাপি? উঃ, কী মজার ঘটনা!

–ব্যাপারটা খুবই জটিল। তবে আসল কথা হল মানুষের সব ভাবাবেগ এক গোপন প্রক্রিয়ায় অ্যানভিলদের মনে চালান করে বা রোপণ করে

দেওয়া হল। অথচ ভিনগ্রহীদের মনে শোকদুঃখ, আবেগ, মন হু হু করা প্রভৃতি কিছুই ছিল না!

এতক্ষণ চুপ করে গল্প শুনছিলেন জেনিয়া। এবার জেনিয়া বলে উঠলেন– ড্রেক, জো-র মতো করে গল্পটা শেষ করো... এত বড় বড় কথা কি ও বুঝতে পারবে?

না না মা... আমি সব বুঝতে পারছি... না বাপি... তুমি সব বলো আমাকে! মাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল কন্যা।

–হ্যাঁ, যা বলছিলাম... নোওয়াল তো বিজ্ঞানের কলাকৌশলে দারুণ বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে প্রত্যেক অ্যানভিলের মধ্যে মানবিক অনুভূতি ঢুকিয়ে দিল।

–মানবিক অনুভূতি? সেটা কী বাপি?

--ভালো প্রশ্নই করেছ। মানবিক অনুভূতি হল, ভালোবাসা, ঘৃণা, উচ্চাশা, ঈর্ষা, হিংসা, অপরের ক্ষতির চেষ্টা করা, শত্রুতা, হতাশা, আশা, ভয়, আতঙ্ক, লজ্জা প্রভৃতি। ব্যাস, খুব অল্প সময়ের মধ্যে অ্যানভিলরা মানবিক আচরণ শুরু করে দিল। দশটা দিনও গেল না... অ্যানভিলদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। শয়ে শয়ে অ্যানভিল মারা পড়ল। কয়েক দিনের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ অ্যানভিল পৃথিবীর বুক থেকে মুছে গেল।

–তাহলে বাপি, অ্যানভিলরা নিজেরাই মারপিট করে মরে গেল?

--তুমি ঠিকই বলেছ মামণি... তবে এরই মধ্যে এক ভিনগ্রহী, নাম তার জলিবার, অ্যানভিলদের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তুললেন। অবশিষ্ট ভিনগ্রহীরাও হানাহানি বন্ধ করে সহমর্মিতার বন্ধনে আবদ্ধ হল। তার মানে ভিনগ্রহীরা সব এককাট্টা হল। তার ফলে পৃথিবীর মানুষেরা নতুন করে দাসে পরিণত হল।

–তাহলে তো নোওয়ালের বুদ্ধি খাটল না। ...গ্রীনল্যান্ডে বসে নোওয়াল তাহলে নিশ্চয় নতুন কোনও ফন্দি আটল?

––না মামনি, নতুন কোনও ফন্দি নয়। তবে মানবিক অনুভূতির মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করল।

–মোক্ষম অস্ত্র? এই যে বললে অস্ত্র সব সেকেলে হয়ে গেছে।

–না না সে অস্ত্র নয়... বুদ্ধিটাকেই অস্ত্রের মতো কাজে লাগাল... অ্যানভিলদের মধ্যে স্বদেশে ফিরে যাবার প্রবল বাসনা জেগে উঠল। শুরু হল মানসিক ছটফটানি।

–বাব্বা, ভারী বুদ্ধি ছিল তো! গালে হাত দিয়ে বিজ্ঞের মতো বলল কন্যা।

–খুউব বুদ্ধি ছিল... দেশে ফেরার জন্যে প্রতিটি অ্যানভিলই পাগল হয়ে উঠল। কতদিন ওরা তারার দেশ ছেড়ে পোড়া পৃথিবীতে এসেছে। সুতরাং একদিন সব অ্যানভিলরা উত্তর আমেরিকার কালো পাহাড়ে জড়ো হল। পাহাড়ি উপত্যকা ভরে অ্যানভিলরা উপচে পড়ল আশপাশে। দেশপ্রেমের গান গাইতে গাইতে ওরা সবুজ ডানা মেলে উড়ে গেল সেই দূর নক্ষত্রলোকে... নিজেদের জন্মভূমিতে।

পৃথিবীর মানুষেরাও মুক্তির আনন্দে নেচে উঠল। পুরো সাত দিন সাত রাত ওরা জয়োল্লাস করল।

–তাহলে বাপি... সব অ্যানভিলরাই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল।

–না না... সক্কলে চলে গেলেও দুই ছোট ছেলেমেয়ে কিন্তু একসঙ্গে যাত্রা শুরু করেও পৃথিবীর বুকে ফিরে এল। ওদের বয়স তখন মাত্র দু'বছর। এই পৃথিবীর বুকেই ওদের জন্ম হয়েছিল... পৃথিবীই ওদের

জন্মভূমি। তাই জন্মভূমির মায়া ওরা কাটাতে পারেনি। ওঁদের কী নাম বল তো মামনি?

–জানি জানি বাপি... একজন জিজ্জো আর একজন জিজ্জা। কিন্তু বাপি... এরপর ওদের কী হল?

––ওরাও খুব বুদ্ধিমান বুদ্ধিমতী, ওরা বড় হল... ঘর সংসার হল... ছেলেমেয়ে হল... তারপর ওরা সংখ্যায় বেড়ে চলল... পৃথিবী ওদের স্বদেশ হল।

–বাঃ বাঃ! কী মজার গল্প... বলেই কন্যা হাততালি দিয়ে ছোট্ট দুই সবুজ পাখা মেলে বাগানে উড়তে শুরু করল।

ব্যবসা – ম্যাক রেনল্ড

শুনুন... ও মশাই... শুনছেন?... পাশ কাটিয়ে যাওয়া প্রথম পদযাত্রীকে চিৎকার করে ও ডাকলেন সময়-ভ্রমণকারী। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল পদযাত্রী। কয়েক পা এগিয়ে এসে সময়-ভ্রমণকারী বললেন–দেখুন, বিংশ শতাব্দী থেকে আসছি। হাতে মাত্র পনেরো মিনিট সময়, তারপরেই আমাকে ফিরে যেতে হবে। না না, আমি বুঝতে পারছি.. কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমার কথাগুলো বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে? তাই না?

–অসুবিধে? অসুবিধে হবে কেন... আপনার অবস্থা বেশ ভালোই বুঝতে পারছি।

–আরে, আপনি দেখি দারুণ ইংরাজি বলেন।

–হ্যাঁ, এই ভাষার নাম এখন আমের... ইংরাজি। তা ছাড়া আমি তো ভাষা-বিজ্ঞানের ছাত্র... অতীতের ইংরেজি ভাষা নিয়েই পড়তে হয়।

–চমৎকার! শুনে দারুণ ভালো লাগল। শুনুন আমার সময় খুব কম। কাজের কথায় আসা যাক।

–কাজের কথা?

–হ্যাঁ, কাজের কথা... বুঝতে পারছেন না। হাতে সময় নেই বললেই চলে। সকলে মিলে আমাকে বাছাই করে ভবিষ্যতে পাঠিয়ে দিয়েছে... আর সেইজন্যেই আমার গুরুত্ব অনেকখানি।

–বুঝলাম। তবে আপনি যতটা ভাবছেন বোধহয় সেটা সঠিক নয়। আজকাল তো হরদম লোক ভবিষ্যতে বেড়াতে আসছে।

–তাই নাকি? দারুণ সুখবর শোনালেন ভাই। কিন্তু আমার ব্যাপারটা একটু আলাদা। সময় খুবই কম। আর কম বলেই এখনকার সব কিছু দেখা সম্ভব নয়। তাই বলছিলাম কী...

–বেশ তো... আপনার কাছে কী কী আছে বলুন?

–কী বলতে চাইছেন? আমার কাছে কী আছে মানে? সময়-ভ্রমণকারীর কণ্ঠে বিস্ময়ের। আভাস।

পদযাত্রীর মুখে বিরক্তির চিহ্ন।

–বেশ লোক তো আপনি। সহজ কথাটাই বুঝতে পারছেন না... আরে আপনি তো প্রমাণ চান... ভবিষ্যতে যে এসেছেন তারই কিছু নমুনা। আপনি জানলেও আমার সাবধান করে দেওয়া কর্তব্য বলেই বলছি... সময়-ভ্রমণের কতকগুলো বিরূপ প্রতিক্রিয়া আছে, যেমন, ভবিষ্যতের কোনও জ্ঞান নিয়ে আপনি অতীতে মানে আপনার নিজের সময়ে ফিরতে পারবেন না... তা না হলে ভবিষ্যতের জ্ঞানের আলো অতীতের

অনেক কিছু পালটে দিতে পারে। সেইজন্যেই নিজের যাবতীয়' মানেই 'সব'। কালে ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের যাবতীয় জ্ঞান আপনার স্মৃতি থেকে নিঃশেষে মুছে যাবে।

–এ কথা তো সকলেই জানে।

–নিশ্চয় জানবে। না জানার তো কিছু নেই। এবার সেই জন্যেই তো এক কথায় আপনার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলাম... আপনার সঙ্গে নিশ্চয় ব্যবসা করব।

–শুনুন, আপনি ব্যবসা বলতে কী বলতে চাইছেন বলুন তো?

–এই সোজা কথাটা কেন বুঝতে পারছেন না, সেটা বুঝতে পারছি না। ব্যাবসা মানে বিনিময়... বিনিময়কেই বোঝাচ্ছি–অর্থাৎ আপনার কালের কিছু নিদর্শনের বদলে এখনকার কিছু নমুনা আপনাকে দিয়ে দেব। অবশ্য আপনার সময়ের কী জিনিসই বা দেবেন আর তার মূল্যই বা কী? তবে ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যবান হলেও হতে পারে। এই পর্যন্ত বলে পদযাত্রী চুপ করে গেলেন। বড় বড় চোখে বিংশ শতাব্দীর দিকে। তাকিয়ে রইলেন। পরে একটু কেশে নিয়ে বললেন–যাই হোক, আমার কাছে এই আণবিক পকেট ছুরি আছে। এই ছুরির অশেষ গুণ... আপনাদের সময়ের কোনও ছুরির সঙ্গে এর তুলনাই চলে না।

–তাই নাকি? দেখুন, আর মাত্র দশ মিনিট আছে... আমারও এমনই একটা জিনিসের দরকার... আর ছুরিটা হলেই আমি প্রমাণ করতে পারব... আমার ভবিষ্যতে আসা নিয়ে কারোর কোনও সন্দেহ থাকবে না।

–আণবিক ছুরিটাই এক দারুণ প্রমাণ হবে... কী বলেন? কথায় সায় দিলেন পদযাত্রী।

–সত্যি আমার ভাগ্যটা দারুণ ভালো... নচেৎ আপনার মতো এমন সরল ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ পাওয়া... যাকগে সে সব কথা... ছুরিটা দিন তাহলে?

–দেবো দেবো... নিশ্চয় দেবো... কিন্তু শুধু শুধু আমার ছুরিটা দেবো কেন? ছুরির বিনিময়ে আমি কী পাব? মানে আপনি কী দেবেন সেটা তো বলুন।

–কিন্তু... দেবার মতো কিছু তো আনিনি... আমি তো বিংশ শতাব্দীর লোক...

–সে তো জানি... আমিও ত্রিংশ শতাব্দীর লোক। বিনিময় ছাড়া আমাদেরও কিছু দেওয়া নিষেধ!

থম মেরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন বিংশ শতাব্দীর প্রতিনিধি। কয়েক সেকেন্ড... মিনিট কেটে গেল। তারপর বললেন... শুনুন ভাই... আমার তো সময় বেশি নেই... বিনিময়ের কথা বলছেন... তা হলে আমার রিস্টওয়াচটা...

–রিস্টওয়াচ! এ যুগে এর কোনও দাম নেই... এ ছাড়া আর কী দিতে পারেন?

–টাকা... বেশ কিছু টাকা আছে আমার সঙ্গে।

–টাকা... এক হাজার বছর অতীতের টাকা নিয়ে কী করব... আমি তো আর Numismatics মানে প্রাচীন মুদ্রাসংক্রান্ত বিষয়ে পড়াশোনা করি না।

--শুনুন, ভাই শুনুন... যা বলছি তাই যদি আপনার কাজে না লাগে... তাহলে... অথচ বিংশ শতাব্দীর নিদর্শন চাই আমার।

–নিদর্শন নিয়ে ভাবনা করবেন না... ছুরিটা দিয়ে দেব... কিন্তু উপযুক্ত বিনিময় ছাড়া তো...

–বেশ... আমার বন্দুকটা নিন।

–বন্দুক... এখনকার যুগে বন্দুকের কোনও ব্যবহারই নেই... বন্দুক ছাড়া...

–হ্যায় ভগবান! যা বলি তাই নয়... অথচ সময়ও শেষ হয়ে আসছে... বেশ ভাই... এবার আপনি বলুন... দেখুন আমার তো জামাকাপড়, মানিব্যাগ... কিছু টাকা, একটা চাবির রিং আর একজোড়া জুতো সম্বল। এর মধ্যে...

–ব্যবসা তো করতে চাই... তবে আপনার বিনিময়মূল্য খুবই নগণ্য...

–শুনুন ভাই... আর তো দেবার মতো কিছুই নেই... আমার যা আছে সব কিছুর বিনিময়ে অনুগ্রহ করে ছুরিটা দিন আমাকে... তবে হ্যাঁ... সব কিছু মানে প্যান্টটাকে বাদ দিয়ে... বুঝলেন না... বিংশ শতাব্দীর ভদ্রলোকের কণ্ঠে অনুনয়ের সুর।

–উঃ, বলেও যে কী মুশকিলে পড়লাম। দেখুন... আপনার যা আছে সব খুলে দিন... প্যান্টটাও লাগবে।

–নিন ভাই.. যা আছে সব নিন... আর সময় নেই... এবার আপনার আণবিক ছুরিটা দিন!

বিনিময় ব্যবসা হয়ে গেল। বিংশ শতাব্দীর ভদ্র ডাকাত পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন। সঙ্গে একরাশ লুটের মাল... জামা, প্যান্ট, মানিব্যাগ, বন্দুক...। সামনেই জন্মদিনের পোষাক পরে বিংশ শতাব্দীর সময়-ভ্রমণকারী দাঁড়িয়ে... হাতে আণবিক ছুরি... সমস্ত মুখমণ্ডল দারুণ তৃপ্তিতে জ্বলজ্বলে...

ক্রমেই ঝাপসা হয়ে উঠছে.. কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া... এবারে আরও অস্পষ্ট... যাও! সব যেন শূন্যে মিলিয়ে গেল।

ছুরিটা শূন্যে ভেসে রইল বেশ কয়েক মুহূর্ত... তারপর সময়-যাত্রীর অবয়ব অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুরিটা মাটিতে পড়ে গেল... ভবিষ্যতের কোনও কিছুই অতীতে যাবে না।

মৃদু হেসে ছুরিটা তুলে নিলেন পদযাত্রী। বিড়বিড় করে বললেন... আচ্ছা বোকা লোক... অতীতের সব লোকই এমন নাকি... অবশ্য 'সময়' ব্যাপারটি খুবই জটিল... এই যুগেই কি সময়ের সব জট খোলা গেছে... কিন্তু সময়-ভ্রমণ করবে অথচ সহজ সরল সত্যটা বুঝবে ... সময়-যাত্রীরা, সামনের দিকে, মানে, কোনও জিনিস অতীত থেকে ভবিষ্যতে নিয়ে আসতে পারে কারণ সময়ের স্বাভাবিক গতিই ভবিষ্যতের দিকে। সময়-স্রোতের বিপক্ষে মানে অতীতে কিছুই নিয়ে যাওয়া যাবে না... এমন কি স্মৃতিতেও না।

সব মালপত্র নিয়ে বাড়ি ফিরলেন পদযাত্রী। দরজায় কোমরে হাত দিয়ে মার্গারেট।

–এত দেরি হল যে? কোথায় যাওয়া হয়েছিল?

--আঃ, ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই অশান্তি শুরু করলে... কত সব জিনিস এনেছি দেখ!

--আবার তুমি...

–রাগ কোরো না... ঠান্ডা মাথায় বোঝবার চেষ্টা করো... আসার পথে এক সময়-যাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল...

–দেখা হয়ে গেলেই...

–অন্যায় কী করলাম... আরে আমি না করলে অন্য কেউ করবে...

–বুঝলাম... কিন্তু রাখবে কোথায় বলো তো... তিন-তিনটে আলমারি বোঝাই হয়ে গেছে...

–মার্গারেট... ঠান্ডা মাথায় বোঝার চেষ্টা করো... একদিন না একদিন মিউজিয়াম বা কোনও কালেকটারের কাছে চড়া দামে বিকোবে... ভাবো এক বার। এক হাজার বছর অতীতের সব জামাকাপড়, বন্দুক...
কথা না বলে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে কাঁধ নাচিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লেন গৃহকত্রী।
–উঃ, বোঝালেও বুঝবে না... মেয়েদের ভাবনার হদিশ পাওয়া খুবই কঠিন... কী জানি... হাজার বছর আগেও মেয়েরা কি এমনই ছিল? বিড়বিড় করে বলতে বলতে লুটের মাল গোছাতে মন দিলেন পদযাত্রী।

চিড়িয়াখানা – এডোয়ার্ড ডি. হচ্

আগস্ট মাস মানেই শিশুদের কাছে দারুণ মজার মাস। বিশেষত তেইশ তারিখের ও আশপাশের দিনগুলো। প্রতি বছর এই দিনেই আকাশের বুক চিরে দেখা দেয় রুপালি মহাকাশযান। প্রফেসর হুগোর আন্তঃগ্রহ চিড়িয়াখানা। চিকাগো শহরের একপ্রান্তে স্থির হয়ে দাঁড়ায় চলমান চিড়িয়াখানা। মাত্র ছ' ঘণ্টার মেয়াদে।
দিনের আলো ফোঁটার অনেক আগে লাইন পড়ে যায়... প্রকাণ্ড লম্বা লাইন। ছেলে বুড়ো, যুবক যুবতী, কচি কঁচা কে নেই লাইনে। প্রত্যেকের হাতে এক ডলারের নোট। উত্তেজনায় সবাই অধীর... প্র. হুগোর চিড়িয়াখানা প্রতি বছরেই নতুন হয়ে আসে। কত সব নতুন নতুন কিম্ভুতকিমাকার জীবজন্তু... অজানা গ্রহ গ্রহান্তরের বিচিত্র সব

বাসিন্দা। না জানি এ বছরেও আরও কী সব নতুন বিদঘুঁটে প্রাণীর দেখা পাওয়া যাবে।

অতীতে কত সব বিচিত্র জীবনমণ্ডলীর সাক্ষাৎ মিলেছে। শুক্রগ্রহের তিন ঠ্যাং-বিশিষ্ট প্রাণী, আবার মঙ্গলের লিকলিকে পাতলা ঢ্যাঙা লোক অথবা সুদূর নক্ষত্রলোকের সরীসৃপজাতীয় ভয়ঙ্কর হিংস্র জীব। এ বছরেও শহরের প্রান্তে তিন শহরের ঠিক মধ্যিখানে বিশাল ময়দানে স্থির হয়ে দাঁড়াল উড়ন্ত চিড়িয়াখানা। পদ্ম পাপড়ির মতো দু'পাশের ঢাকনাগুলো ধীরে ধীরে খুলে মাটিতে নেমে এল। স্পষ্ট দেখা যায় মহাকাশযানের অভ্যন্তরে সার সার পেল্লায় খাঁচার লাইন। মোটা মোটা লোহার রড অথবা কেউ যেন ভগবানের সাক্ষাৎ পরিহাস। ছোট্ট ঘোড়ার মতো জন্তু লাফিয়ে লাফিয়ে চলে... চলার সময়ে ছোট্ট দেহটা যেন নেচে নেচে ওঠে... মুখে ওদের অনর্গল ঝড় তোলা বকবকানি। প্রফেসরকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর দর্শকেরা... টিকিট কাউন্টারে ডলারের স্তূপ জমে যায়। টিকিট কাটা শেষ হলে প্রফেসরের কণ্ঠস্বর শোনা যায়... গুরুগম্ভীর ভরাট কণ্ঠস্বর বিচিত্র মায়াজাল বুনে চলে। মাথার ওপরে রামধনু রঙের অদ্ভুত টুপি। মাইক্রোফোন হাতে প্রফেসর বলে ওঠেন– আমার প্রিয় পৃথিবীর ভাইবোনেরা...

মুহূর্তের মধ্যে কোলাহল বন্ধ হয়ে যায়। প্রফেসর গমগমিয়ে বলে চলেন– পৃথিবীর প্রিয় ভাইবোনেরা, আবার আমি এসেছি, সঙ্গে এনেছি আনকোরা নতুন বিচিত্র সব প্রাণীর সম্ভার। তোমরা এক ডলারের বিনিময়ে দুর্লভ অভিজ্ঞতা অর্জন করো। এখানেই দেখতে পাবে কান গ্রহের ঘোড়া-মাকড়শা মানুষ! লক্ষ লক্ষ মাইল দূরের নীল সূর্যের চারপাশে বন বন করে ঘোরে তার কান গ্রহ... যেমন বিচিত্র গ্রহ, ঠিক তেমনি বিচিত্র তার সব প্রাণী। এসো এসো... ঘুরে ঘুরে দেখ... বিচিত্র

জীবদের চালচলন লক্ষ করো। কান পেতে শোনো ওদের কথাবার্তা, যদিও সব ভাষা তোমরা বুঝবে না। তোমাদের বন্ধুদের বলো, তারাও দলে দলে আসুক মনে রাখবে, সময় কিন্তু খুবই অল্প... ঠিক ছ'ঘণ্টা পরেই স্পেসশীপ চলে যাবে!

সারবন্দী দর্শকদের চোখেমুখে নিদারুণ বিস্ময় আর আতঙ্ক! কী ভয়ঙ্কর সব জীব... দেখলেও গা শিউরে ওঠে... ঠিক যেন ঘোড়া, কিন্তু তড়বড়িয়ে মাকড়শার মতো খাঁচার দেওয়াল বেয়ে ওপরে উঠছে আর নামছে।

–সত্যি ভাই, যা দেখলাম তার কাছে এক ডলার কিছুই নয়। চল চল বাড়ি যাই, ছেলেমেয়েকে নিয়ে আসি। সকলেই প্রায় এমন কথা বলে বাড়ির সকলকে আনতে ছোটে।

সারাদিন ধরে জনস্রোত ধেয়ে আসে মহাকাশযানে। দু'পাশে বড় বড় খাঁচার সারি... মাঝে সরু পথ। সেই পথ ধরে উৎসুক নয়নে জনপ্রবাহ চলে মহাকাশযানের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। তবুও দেখার আশ মেটে না। কিন্তু সময়ের অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে। প্রফেসর হুগো মাইক্রোফোন হাতে তুলে নেন।

–এবার আমাকে বিদায় দাও পৃথিবীর ভাইবোনেরা। আবার আসব সামনের বছর একই দিনে একই সময়ে। সঙ্গে থাকবে নানান অজানা গ্রহের অজানা সব বিচিত্র প্রাণী। চিড়িয়াখানা যদি ভালো লাগে তবে তোমাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের বোলো কাল আমরা নিউ ইয়র্কে নামব... পরের সপ্তাহে চলে যাব লন্ডন, প্যারিস, রোম, হংকং, টোকিওতে। তারপরই পৃথিবীর পাট শেষ করে উড়ে যাব অন্য গ্রহে।

দর্শকসমাজ হাততালি দিয়ে বিদায় অভিনন্দন জানাল। মহাকাশযানও ধীরে ধীরে বাতাসে ভর করে আকাশে উঠে গেল। ঘরে ফেরার পথে

সকলের মুখেই এক কথা– প্র. হুগোর তুলনা নেই... এ চিড়িয়াখানার কোনও তুলনাই হয় না।

ইতিমধ্যে তিনমাস কেটে গেল এবং তিন-তিনটে গ্রহ পরিক্রমা শেষ করে প্র. হুগোর রুপালি মহাকাশযান কান গ্রহের প্রকাণ্ড দুই পাহাড়ের মাঝে ধীরে ধীরে নামল। ঘোড়া মাকড়শা প্রাণীর দল খাঁচার দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র গতিতে যে যার ঘরের দিকে দৌড় মারল... পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ওদের ঘরেও আনন্দের কলরোল শোনা গেল... প্র. হুগোর মুখে সাফল্যের হাসি।

একজনের ঘরওয়ালি লাফাতে লাফাতে বাইরে বেরিয়ে এল। এতদিন পরে বাড়ির কর্তা ফিরে আসায় দারুণ খুশি। বিচিত্র ভাষার কলকল শব্দ করে উঠল সে। জিভটা তালুতে ঠেকিয়ে এরা অনর্গল আওয়াজ করে চলে। খুবই জটিল ভাষা।

–উঃ বাব্বাঃ কতদিন পরে এলে বলো তো? আমি দুশ্চিন্তায় মরি। যাক বেড়ানো ভালো হয়েছে তো? কেমন সব দেখলে?

পুরুষ প্রাণী বলে উঠল, উঃ কী যে দেখলাম... বলে বোঝানো যাবে না... ছেলেমেয়েরা তো আসতেই চায় না। মোট আটটা গ্রহ আমরা দেখেছি... সেখানকার কত সব কিম্ভুতকিমাকার প্রাণী।

ছোট্ট শিশুটি তরতর করে গুহার দেওয়াল বেয়ে ছাদে উঠে পড়ল। শিশু কণ্ঠে সে-ও বলে ওঠে– সবচেয়ে ভালো লাগল যেটা তার নাম পৃথিবী... অবশ্যই ওখানকার প্রাণীরা আছে বলেই। কী অদ্ভুত দেখতে.. দেহ ঘিরে সবাই পোশাক পরে... কী সব রং! সবচেয়ে আশ্চর্য কী জানো... ওরা দু'পায়ে চলে... আমার কেবলই ভয় হত এই বুঝি পড়ে যাবে...

–বাপস! কী সাংঘাতিক! শুনলেই তো ভয় লাগে... ঘরওয়ালি জননী বলে ওঠেন।

–না না, ভয়ের কিছু নেই... আমাদের সুরক্ষার জন্যে চারপাশ ঘিরে মোটা মোটা লোহার রডের তৈরি মজবুত ঘর ছিল... আমরা তো সেই ঘরের মধ্যে দিব্যি বসে– স্পেসশীপ থেকে বাইরে যাওয়া মানা ছিল। দু'পেয়ে প্রাণীরা দল বেঁধে আমাদের ঘরের সামনে ঝুঁকে পড়ে কিন্তু না, ঘরে ঢুকতে পারেনি। জানো, সামনের বছর তোমাকে নিয়ে যাব... খরচা একটু বাড়লেও দেখার মতো দু'পেয়ে প্রাণী।

ছোটও বলে উঠল– পৃথিবীর চিড়িয়াখানাটাই সবচেয়ে ভালো।

ডক্টর – হেনরি সেলসার

এমপ্লয়মেন্ট অ্যাডভাইসার যথারীতি পেশাদারি শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন। পেশাদারি দুনিয়ায় মাথা ঠান্ডা রেখে মুখের হাসিকে চিরস্থায়ী রাখার কৌশল বেশ ভালোভাবেই জানা আছে তাঁর। তাই সহাস্য মুখে তিনি বললেন– না না... আপনার মতো লোকের কিছু করা দরকার। বিশেষত, আপনার মতো উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের তো বটেই। সর্বগ্রাসী যুদ্ধ হয়েছে তো নিশ্চয়ই, তাহলেও তো আমরা অসভ্য বর্বর হয়ে যাইনি। সত্যি বলতে কী, সর্বনাশা যুদ্ধের পরে বিশেষত শিক্ষকদের চাহিদা বহুগুণ বেড়ে গেছে!

ড. মেখাম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, বুঝতে একটু ভুল হচ্ছে। সাধারণত শিক্ষক বলতে যা বোঝায় আমি ঠিক তা নই। আমি যে

বিষয়ে অভিজ্ঞ, লেখাপড়া করেছি, সে বিষয়ের আজ আর কোনও চাহিদাই নেই। তবে আমি জানি মানুষ জানতে চায়... ওদের ঘাড়ে চাপানো যুদ্ধোত্তর ধ্বংসস্তূপ নিয়ে ওরা কী করবে, কেমন করে বাড়ি-ঘরদোর করবে, রাজমিস্ত্রির কাজ শিখবে কোথায়? কলাকুশলী যন্ত্রবিদ পাবে কেমন করে? গুঁড়িয়ে যাওয়া শহরগুলোকে কেমন করে আবার গড়ে তুলবে?... বন্ধ হওয়া যন্ত্রের কাজ শুরু হবে কেমন করে? তেজস্ক্রিয়ায় আক্রান্ত, অসুস্থ, অশক্ত হাড়-গোড়ভাঙা মানুষদের কেমন করে চিকিৎসা করবে? বোমায় পঙ্গু জনসাধারণের কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রয়োজন। কিন্তু কে বা কারা কেমন করে তৈরি করবে... দৃষ্টিশক্তিলুপ্ত মানুষ কেমন করে স্বাবলম্বী হবে... বিকলাঙ্গ বিকৃতমস্তিষ্ক মানুষের কী হবে? এই সব সমস্যারই আশু প্রতিকার ওরা জানতে চায়, শিখতে চায়। আর সে কথা তো আপনার চেয়ে বেশি কেউ জানে না।

–কিন্তু এখানে কি আপনার মতো একজন বিশেষজ্ঞের কোনও ভূমিকা নেই ডক্টর? আপনার বিষয়ের কি কোনও চাহিদা নেই? আর একবার চেষ্টা...

–এবার হেসে ফেললেন ড. মেখাম।

–চেষ্টা যে আমি করিনি তা নয়। চেষ্টা করেছিলাম... মানুষকে আগ্রহী করার সব চেষ্টাই বারে বারে বিফল হয়েছে। জানেন, গত কুড়ি বছর ধরে ছাত্রদের একটা বিষয়েই শিক্ষা দিয়ে এসেছি... মেমারি অর্থাৎ স্মরণশক্তি মানুষের এক বিশেষ সম্পদ... আর এই স্মরণশক্তিকে যথাযথ ধরে রাখার কৌশল শেখানোই হল আমার কাজ। জানেন, ছ-ছ'টা বই লিখেছি আমি... বাজারেও বেরিয়েছিল। তার মধ্যে দুটো বই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হয়েছিল। শান্তিচুক্তি হওয়ার বছরেই আমি আট সপ্তাহের এক বিশেষ কোর্স-এর জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম... কিন্তু

ফল কী হল জানেন? মাত্র একটা দরখাস্ত পেলাম। অথচ এটাই হল আমার প্রফেশন... এতদিন এটাই আমার কাজ ছিল। এই নতুন পরিবেশে আমি কী করব তা বুঝে উঠতে পারছি না... যুদ্ধোত্তর বিভীষিকা আর মৃত্যুর রাজত্বে আমার আর কোনও কাজ নেই... আমি একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলাম। এক বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে গেলেন ড. মেখাম।

মুখে কোনও কথা নেই। আপনমনে নিচের ঠোঁট কামড়ে চলেছেন এমপ্লয়মেন্ট অফিসার। এ এক রীতিমতো চ্যালেঞ্জ... যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বিশেষজ্ঞদের যথাযথ পুনর্বাসন নিয়ে নানান সমস্যা দেখা দেয় ঠিকই, কিন্তু তার সমাধানও পাওয়া যায়। কিন্তু ড. মেখামকে... নিজের মনেই চিন্তার ঝড় চলছে। ড. মেখাম থাকাকালীন কোনও সমাধানই তিনি খুঁজে পেলেন না। অবশেষে হতোদ্যম ডক্টর ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। ওঁর সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে পড়া নুজ দেহটার দিকে তাকিয়ে ব্যথায় টনটন করে উঠল বুকটা। নিজের প্রতি এক অজানা ক্রোধ জমে উঠল। কিন্তু সেই রাতেই যুদ্ধের এক মর্মন্তুদ ভয়াবহ ঘটনার স্বপ্ন দেখে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলেন অ্যাডভাইসার... রাতের পর রাত একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। শুধু উনি নন, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সকলেই নিশাতঙ্কের শিকার। অন্ধকার ঘরে বিছানায় শুয়ে রইলেন। অ্যাডভাইসার... খোলা দুই চোখে কোনও দৃষ্টি নেই... মনের গভীরে চিন্তার ঝড় উঠেছে। ড. মেখামের হতোদ্যম চেহারাটা ভেসে উঠছে বারবার। অবশেষে ভোরেই সমাধানের হদিশ পেয়ে গেলেন তিনি।

ঠিক একমাস পরে সরকারি কাগজে ফলাও করে এক বিজ্ঞাপন ছাপা হল.. হুগো মেখাম, পিএইচডি

শুরু হচ্ছে আট সপ্তাহব্যাপী এক যুগান্তকারী কোর্স। ভুলে যাবার সহজ উপায় বা কেমন করে ভুলব। সেপ্টেম্বর ৯ তারিখে নাম লেখানো শুরু। সঙ্গে সঙ্গে আশাতীত সাড়া মিলল।

আবিষ্কার – জর্জ আর. আর. মার্টিন

হাইপারস্পেস আছে। এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। গণিতের মাধ্যমে হা আমরা এটা প্রমাণও করেছি। যদিও হাইপারস্পেস-এ গতিপ্রকৃতি এখনও আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। তবে এই বিষয়ে নিশ্চিত যে নর্মাল স্পেসের আইনকানুন এখানে খাটবে না। হাইপারস্পেসে আলোর গতিবেগই যে গতির শেষ সীমা একথা ভাবার কোনও কারণ দেখি না। এইসব কারণেই নর্মাল স্পেস থেকে হাইপারস্পেসে যাবার এবং ইচ্ছেমত ফিরে আসার সহজ পথ খুঁজে বার করতে হবে। উপযুক্ত হাইপার ড্রাইভ আবিষ্কারের জন্যে অর্থ বরাদ্দ করো... আমি নক্ষত্রলোকে পৌঁছে দেবো।

–ড. ফেড্রিক ডি ক্যানফেরেলি, এফটিএল ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা (২০১৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে জেনিভাতে অনুষ্ঠিত টেকনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভায় প্রদত্ত বক্তব্যের সারাংশ)।

সকলেই জানে যে, পিপীলিকা রবারবৃক্ষ হেলাতে পারে না।

--এফটিএল ফাউন্ডেশনের সংকল্প।

পেটমোটা এক চাউস ফাইল বগলে করে হন্তদন্তভাবে ঘরে ঢুকলেন কিনেরি। রীতিমতো লড়াকু যুবক। মাথা-ভরতি কদমছাঁট চুল, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখেমুখে শাণিত বুদ্ধির আভা।

এফটিএল ফাউন্ডেশনের ডেপুটি ডিরেক্টর জেরোমি স্বেচার-এর দু'চোখে ক্লান্তির ছাপ। কথা না বলে তিনি অপলক নয়নে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিনেরিও অভ্যর্থনার তোয়াক্কা না করে টেবিলের ওপরে ফাইলটা রেখে চেয়ার টেনে বসে পড়লেন।

--গুডমর্নিং স্বেচার, আমাকে দেখে অবাক হয়েছেন নিশ্চয়? হবারই কথা... অন্য কেউ হলে ঢুকতেই পারত না... সিকিউরিটির বেড়াজাল ভেদ করে যে ঢুকতে পারব ভাবতেই পারিনি। সত্যি, কী বিচিত্র লোক আপনি। দেখা করতে হলে এত কাঠখড় পোড়াতে হবে? বিরক্তির সুরে গড়গড় করে বলে গেলেন কিনেরি।

–আপনিও তো মশাই সোজা লোক নন। দেখা হবে না বলা সত্ত্বেও গায়ের জোরে ঢুকে পড়েছেন। স্বেচারের কণ্ঠে চাপা উষ্মার আভাস। ডেপুটি ডিরেক্টর লম্বাচওড়া বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী। সর্বাঙ্গে মেদের উল্লাস। দুই চোখের ওপরে ঘন কালো মোটা । একমাথা ধূসর চুলে ভরা।

–আমার সম্বন্ধে আপনার অনুমান যথার্থ। যেমন বুনো ওল তেমনই বাঘা তেঁতুল না হলে কি চলে! যাক, বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করব না। এখানেই আরও অনেকের সঙ্গে দেখা করতে হবে। এবার কাজের কথায় আসি। বলুন তো আর কতকাল ঘুরতে হবে?

–ঘুরতে হবে! কী বলতে চাইছেন স্পষ্ট করে বলুন মি. কিনেরি। মৃদু হাসির মধ্যেই ধীরে ধীরে বললেন স্বেচার।

–ওঃ, আবার না জানার ভান করছেন? আমি কে, কী জন্যে যাতায়াত, সেটা নিশ্চয় আপনার অজানা নয়। আর এটাও জানেন নিশ্চয়, আমার মতো একজন পদার্থবিজ্ঞানী বছরের পর বছর কেন আপনাদের কাছে ধর্না দিচ্ছি! আমি নিশ্চয় আশা করব আপনার মধ্যে এখনও বিজ্ঞানীসুলভ মনোভাব আছে এবং হাইপারস্পেস সম্বন্ধে আমার জমা দেওয়া থিসিস আপনি দেখেছেন। আর এটাও নিশ্চয় আপনার অজানা নয় যে একমাত্র আমার থিয়োরিই সবচেয়ে বাস্তবসম্মত। লোপেজ এর পরে আমিই, হ্যাঁ হ্যাঁ... একমাত্র আমি হাইপারস্পেস সমস্যার সমাধান করেছি। সেও তো আজকের কথা নয়। তিরিশ বছর হয়ে গেল। হাইপার ড্রাইভ ইঞ্জিনের নক্সা প্রায় তৈরি হয়ে গেছে। সে কথাও আপনার অজানা নয়! তা ছাড়া হাইপারস্পেস নিয়ে যাঁরা গবেষণা করছেন তাঁদেরও এ কথা অজানা নয়। বেশ রাগত স্বরে কথাগুলো বলে গেলেন কিনেরি।

স্বেচার নিরুত্তর। শুধু নির্নিমেষনয়নে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। মোটা জোড়া থেকে থেকে কুঁচকে উঠছে।

–কিন্তু এখন আবার ফান্ডের প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কেনার মতো ক্ষমতা আমার ইউনিভার্সিটির টাকা দেবার নেই। আর সেই জন্যেই আমি এফটিএল-এর দ্বারস্থ হয়েছিলাম। কিন্তু মি. স্বেচার, আপনি, মানে আপনারা যা করলেন... ছিঃ ছিঃ, আমার পোপোজালে কোথায় আপনারা খুশি হবেন তা নয়, পুরো ব্যাপারটাই চেপে গেলেন? একবছর হয়ে গেল কোনও উচ্চবাচ্য নেই! অথচ বারে বারে আমি জানতে চাইছি। আর আপনারাও একই জবাব লিখে চলেছেন, যথাসময়ে জানানো হবে। আবার টেলিফোন করলেই সেক্রেটারির উত্তরও বাঁধা গতে... হয় কনফারেন্সে আছেন নয়ত জরুরি মিটিং, নয়ত

বিশেষ কাজে বাইরে। কথা শেষ করে দুই হাত টেবিলের ওপরে রেখে জিজ্ঞাসুনেত্রে স্বেচারের দিকে তাকালেন কিনেরি।

নিরুত্তাপ স্বেচারও একমনে পেপারওয়েট আঙুল দিয়ে ঘুরিয়ে চলেছেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে গভীর নিশ্বাস ফেলে বললেন– খুব রেগে গেছেন দেখছি! আপনি তো জানেনই, রেগে গেলে কোনও কাজ হয় না, উপরন্তু শরীরের ক্ষতি হয়। শান্ত হোন... এক কাপ কফি খান!

দপ করে জ্বলে উঠলেন কিনেরি।

–আমি মানুষ বলেই রেগে উঠেছি... অন্য কেউ হলে... থাক সে কথা। আমার ভাবতে আশ্চর্য লাগে হাইপারস্পেস ড্রাইভের জন্যই এফটিএল ফাউন্ডেশনের জন্ম। আর আমি যখন হাইপার ড্রাইভ ইঞ্জিন আবিষ্কারের মুখে তখন আপনারাই মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছেন, এমনকি আমার কথা শোনার সময় পর্যন্ত আপনাদের নেই।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নড়ে চড়ে বসলেন স্বেচার। কয়েক মুহূর্ত কিনেরির দিকে তাকিয়ে বললেন প্রথম থেকেই এক ভুল অনুমানের ওপরে কাজ করে চলেছেন মি. কিনেরি। আলোর চেয়ে দ্রুত গতিবেগ সম্ভব কিনা এবং তা সম্ভব হলে আয়ত্ত করার উপায় কী হবে। এই বিষয়ে গবেষণার জন্যই এফটিএল ফাউন্ডেশানের জন্ম। এককথায় বলা যায়। নক্ষত্রলোকে পৌঁছোবার সহজতম দ্রুত উপায় খুঁজে বার করাই এর প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছোবার অন্যতম পথ হল হাইপারস্পেস। এখন আমরা অন্য এক পথের সন্ধান পেয়েছি... সে পথে...

কথা শেষ হবার আগেই কিনেরি বলে উঠলেন– হ্যাঁ হ্যাঁ, সব পথেরই হদিশ আমার জানা আছে। কানাগলি দেখেছেন? কানাগলি? ঢুকলে আর বেরোবার পথ থাকে না। এতে অর্থের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। করদাতাদের পয়সা খোলামকুচি নয় সেকথা যেন আপনাদের

স্মরণে থাকে। বলিহারি যাই আপনাদের! এলিসনের টেলিপোর্টেশান রিসার্চে টাকা লাগালেন। ক্লডিয়া ডানিয়েলের এসপার ইঞ্জিনে মদত যোগালেন, চুঙের টাইম স্টেসিস হাইপোথিসিস-এর পেছনে এখন ছুটছেন... একবার ভেবে দেখুন কী বিপুল পরিমাণ অর্থের অপচয় হল? সত্যি কথা বলতে কী জানেন? ক্যানফেরেলির মৃত্যুর পর থেকেই কোটি কোটি টাকার নয়ছয় হয়েছে। এঁদের মধ্যে একজনই সঠিক পথে চলেছিলেন... লোপেজ... লোপেজের পথই ছিল নির্ভুল। ফল কী হল? না– গবেষণা থেকে সরিয়ে দিলেন ওঁকে। সায়েন্টিস্ট লোপেজ হয়ে গেলেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর! সত্যি আপনাদের বুদ্ধির তারিফ করতে হয়!

স্বেচারের মুখে কোনও কথা নেই। এক মনে পেপারওয়েট ঘুরিয়েই চলেছেন। উত্তেজনায় কিনেরির মুখমণ্ডলও রক্তলাল হয়ে উঠেছে। নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরেছেন তিনি।

--আমি শুনলাম আপনি নাকি সিনেটার মার্কহ্যামের সঙ্গেও দেখা করবেন? সেখানেও কি এই সব অভিযোগ তুলবেন? খুব ধীরে ধীরে কথাগুলো বললেন স্বেচার।

–একেবারে ধ্রুব সত্য। আপনাদের কাছ থেকে সঠিক জবাব পেয়ে গেলে অবশ্য ভেবে দেখতে হবে। যদি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন, আমি শুধু সিনেটারের কাছেই যাব না, সিনেট টেকনোলজিক্যাল কমিটির কাছেও যাব... আপনাদের কীর্তিকাহিনি সব ফাঁস করে দেব। তখন কিন্তু আমাদের দোষারোপ করতে পারবেন না।

মৃদু মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন স্বেচার। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে কয়েকটা টান দিয়ে টানটান হয়ে বসলেন।

–মি. কিনেরি, সন্তুষ্ট হওয়া না হওয়া আপনার ব্যাপার। তবে আমার তরফ থেকে কোনও ত্রুটি রাখব না। মি. কিনেরি, আপনি কি মনে করেন জনসংখ্যার চাপে নাভিশ্বাস ওঠা পৃথিবীর বুকে আর কি কোনও খালি জায়গা আছে?

–না... হ্যাঁ, সে দিক থেকে...

–না না... পাশ কাটাবার চেষ্টা করবেন না... ভালো করে চিন্তা করে দেখুন। তাহলে আমি বলি শুনুন... পৃথিবীতে আর তিল ধারণের স্থান নেই। শুধু পৃথিবী না চাঁদ, মঙ্গল এবং ক্যালিস্টোতে পর্যন্ত জনসংখ্যা উপচে পড়ছে। এ বিষয়ে কাগজে কাগজে যথেষ্ট লেখালেখি হচ্ছে। এক কথায় মানুষ এখন এক কানাগলির মধ্যে ঢুকে পড়েছে। মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে এখন নক্ষত্রলোকেরই প্রয়োজন। সারা মানবজাতি এখন এফটিএল ফাউন্ডেশানের দিকে তাকিয়ে আছে... আর এই প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তোলার জন্যে কনফেরেলির দূরদৃষ্টির তুলনা নেই। আবার জনসাধারণের কাছে ফাউন্ডেশনের অর্থই হল হাইপারস্পেসের মন্ত্রগুপ্তি।

কিনেরি অধৈর্য হয়ে উঠলেন। একটু চিৎকার করেই বলে উঠলেন– থামুন থামুন... এসব গালগল্প বছরভরে শুনে আসছি... আপনার কর্মচারীদের মুখে মুখে শুধু একই কথা। এসব কথা আমার জানা... নতুন কিছু থাকে তো বলুন মি. স্বেচার।

কথা না বলে মৃদু হাসলেন স্বেচার। চেয়ার ছেড়ে উঠে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বাইরে নীলাকাশ ছুঁই ছুঁই শহরের বিস্তৃতি... সমান্তরালে স্থান সীমিত হওয়ায় লম্বভাবে আকাশের বুকে হাত বাড়িয়েছে মেগাপোলিশ।

--মি. কিনেরি, একথা কি একবারও ভেবে দেখেছেন যে, লোপেজ ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর হওয়া সত্ত্বেও নিজের হাইপারস্পেস রিসার্চ প্রজেক্ট গ্রান্ট পেল না কেন? হাইপারস্পেস নিয়ে লোপেজের গবেষণা অনেকদূর এগিয়েও ছিল।

–হ্যাঁ, সেটা অবশ্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক... কথা শেষ করতে না দিয়ে স্বেচার বলতে শুরু করলেন– না না মি. কিনেরি, অতীতের ঘটনা আলোচনা করে সময় নষ্ট করতে চাই না... এখন আর তার প্রয়োজনও নেই... আপনার কথা মানছি যে, বেশ কিছু উদ্ভট থিয়োরির পেছনে অনেক টাকাই ঢালা হয়েছে... কারণ, নেই-মামার চেয়ে কানা-মামা ভালো। কিছু না হওয়ার চেয়ে অন্তত কিছু চেষ্টা চলুক। হাইপারস্পেস আমাদের কাছে কানাগলি ছাড়া আর কিছু নয়... কিন্তু জনসাধারণের হাইপারস্পেসের স্বপ্নকে ইচ্ছে করেই ভেঙে দিইনি... কারণ স্বপ্নভঙ্গের কারণে মানসিক অবসাদ আসবে... আর তার ফলে বেঁচে থাকার আশা, ভবিষ্যতের স্বপ্ন কিছুই থাকবে না... একটা সামাজিক বিপ্লব ঘটাও বিচিত্র নয়।

–না না হাইপারস্পেসের স্বপ্ন মিথ্যে নয়... একবার আমাদের কাগজগুলো ভালো করে দেখুন... আমাকে ফান্ড দিন... দু'বছরের মধ্যে হাইপারস্পেস ইঞ্জিন বানিয়ে দেব।

কিনেরির সামনে এসে দাঁড়ালেন স্বেচার। মোটা জ্বর নিচে বড় বড় চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল।

–আমি জানি মি. কিনেরি... হাইপারস্পেস ইঞ্জিন আপনিই বানাতে পারবেন সে বিশ্বাস আমার আছে। মনে করে দেখুন কনফেরেলির কথাগুলো! হাইপারস্পেসেও আলোর গতিবেগই যে গতিবেগের শেষ সীমা এমন ভাবার কোনও কারণ নেই– একেবারে অক্ষরে অক্ষরে

সত্যি এই কথাগুলো। হাইপারস্পেসে এ নিয়ম খাটে না। আমি খুবই দুঃখিত মি. কিনেরি। এ কথার মধ্যে একটুকুও ছলচাতুরী নেই। আজ থেকে ঠিক তিরিশ বছর আগে লোপেজ-ই হাইড্রাইভ আবিষ্কার করেছিলেন। এ কথা এখন আপনি ছাড়া বাইরের আর কেউ জানে না... আর তখনই আমরা জানতে পারলাম হাইপারস্পেসের সর্বোচ্চ গতিবেগ আলোর গতিবেগ নয়।

--কম... অনেক কম সর্বোচ্চ গতিবেগ।

দেশপ্রেমিক – অ্যামব্রোস বিয়ার্স

সম্রাট আম দরবারে বসেছেন। এমন সময়ে সেই প্রতিভাধর দেশপ্রেমিক পকেট থেকে কাগজ বার করে বললেন– সম্রাট, আপনি শুনে খুশি হবেন যে, আমার কাছে এমন এক ফরমুলা আছে যার ফলে এমন ধাতব চাদর তৈরি হবে যেটাকে কোনও কামানের গোলা বিদীর্ণ করতে পারবে না। এমন সব প্লেটগুলো যদি রাজকীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজে লাগানো হয়, তাহলে আপনার যুদ্ধজাহাজ দুর্ভেদ্য হয়ে উঠবে অর্থাৎ অজেয় হবে। আপনার মন্ত্রীর রিপোর্টও আছে... ওঁর মতে এই আবিষ্কার অতীব প্রয়োজনীয়। দশ লক্ষ মুদ্রার বিনিময়ে আমি এই ফরমুলা আপনাকে দিতে পারি।

কাগজগুলো সরেজমিনে দেখার পর সম্রাট মন্ত্রীকে এগুলি রাখতে দিলেন এবং অর্থমন্ত্রীকে প্রার্থিত মুদ্রা দিয়ে দেবার আদেশ দিলেন।

এরপর দেশপ্রেমিক পকেট থেকে আরও একটি কাগজ বার করে বললেন– সম্রাট এই কাগজে এমন এক কামানের নক্সা আছে যা ওই অজেয় প্লেটটাকে বিদীর্ণ করতে পারবে... এটাও আমারই আবিষ্কার। আপনার ভ্রাতা ব্যাঙ্গের সম্রাট নিজেই কিনে নেবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কিন্তু আপনার প্রতি আমার আনুগত্যই আমাকে বাধা দিল। আপনাকেই আমি এটা দিতে চাই। এটার মূল্যও একলক্ষ মুদ্রা।

এই মুদ্রা পাবার প্রতিশ্রুতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর এক পকেট থেকে আর একটা কাগজ বার করলেন দেশপ্রেমিক।

–সম্রাট, ওই কামানের গোলার হাত থেকেও ধাতব চাদর আরও দুর্ভেদ্য করে তোলা যায় যদি আমার এই ফরমুলা অনুযায়ী সেই ধাতব চাদরকে...

কথা শেষ হবার আগেই ইশারায় সেনাপতিকে ডাক দেন সম্রাট।

এই লোকটির সব পকেট খোঁজো আর গুনে বলো মোট ক-টা এর পকেটে আছে।

–তেতাল্লিশ স্যার। সর্বাঙ্গ অনুসন্ধান করে সেনাপতি উত্তর দিল।

–সম্রাট, বিয়াল্লিশটা হবে... একটাতে শুধু চুরুট আছে। দেশপ্রেমিকের কণ্ঠস্বরে আতঙ্কের ছাপ! –দু'পায়ে গোড়ালি বেঁধে মাথা নিচু করে শূন্যে ঝুলিয়ে দাও একে... তারপরে দাও জোরে জোরে ঝাঁকানি। হ্যাঁ, ওকে বিয়াল্লিশ লক্ষ মুদ্রার চেকটাও দিয়ে দিও। তারপর ওকে শূলে চড়াও। রাজ্যময় ঘোষণা করে দাও যে, উদ্ভাবনী দক্ষতা এক জঘন্য অপরাধ... শাস্তি মৃত্যুদণ্ড!

বাছাই – হেনরি সেলসার

আজ ডিকির বয়স বারো বছর পূর্ণ হল। এতদিন পরীক্ষার কথা নিয়ে আলোচনা আI করেননি কেউ। আজই প্রথম ছেলের সামনে পরীক্ষার কথা বললেন শ্রীমতি

জর্ডান। স্ত্রীর কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠার আভাস বুঝেই তড়িঘড়ি স্বামী জবাব দিলেন। –ভুলে যাও... ভুলে যাও পরীক্ষার কথা... আমি বলছি ডিকি পাশ করবে। সকালবেলায় প্রাতঃরাশের টেবিলে বসেই আলোচনা হচ্ছিল। ডিকিও সামনে বসেছিল। পরীক্ষার কথা শুনে মায়ের দিকে তাকাল ডিকি। খুব স্মার্ট, সদাসতর্ক ডিকির একমাথা ভরতি সোনালি চুল। দু'চোখের তারায় তারায় বুদ্ধিমত্তার ছাপ। পরীক্ষা নিয়ে কেন যে বাবা-মা মাথা ঘামাচ্ছে সেটাই ওর বোধগম্য হল না। আজ ওর জন্মদিন... জন্মদিনের কথা না বলে কেবল পরীক্ষার কথা। ওদের ছোট্ট ফ্ল্যাটে রংবেরঙের কাগজে মোড়া নানান আকারের উপহার জমা হয়ে আছে। জলখাবারের পরে কখন যে সে ওগুলো খুলবে সেই ভাবনায় অস্থির। ছোট্ট ওয়াল কিচেনে অটোমেটিক স্টোভে কী যেন তৈরি হচ্ছে... মিষ্টি সুবাসে চারপাশ ম ম করছে। ঘুম ভাঙার পরই মনে হয়েছিল আজ জন্মদিন... সকাল থেকে মা বাবার সঙ্গে হুল্লোড় করবে তা নয়... সকাল থেকেই পরীক্ষার কথা। ছলছল মায়ের চোখ–বাবার গম্ভীর মুখ– মেপে মেপে কথা– সব আনন্দ মাটি করে দিল।

–কোন পরীক্ষার কথা বলছ?

মুখের দিকে না তাকিয়ে মা বললেন– এটা এক সরকারি পরীক্ষা। ইন্টেলিজেন্স টেস্ট। বারো বছরের সব ছেলেমেয়েদেরকেই এই

পরীক্ষায় বসতে হয়। সামনের সপ্তাহে তোমাকেও পরীক্ষায় বসতে হবে। তবে ভয় পাবার কিছু নেই ডিবি।

-মানে স্কুলের মতো পরীক্ষা?

–অনেকটা। তবে ভাবনার কিছু নেই। যাও ডিকি ঘরে গিয়ে কমিকস পড়ো। খাবার টেবিল থেকে সরিয়ে দেওয়াই যেন বাবার মতলব– এমন তো বাবা আগে কোনওদিন করেনি? নানান সাত-পাঁচ চিন্তা করল ডিকি।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে উঠে পড়ল ডিকি। পায়ে পায়ে চলে গেল ঘরের এক কোণে। রাশ রাশ গল্পের বই ডাঁই করা... জ্ঞান হওয়া অবধি এটাই ওর একান্ত আপন জায়গা।

নতুন এক কমিক্স-এ বই সামনে মেলে ধরল। পাতার পর পাতা উলটে গেল– কতই জমকালো মজার মজার ছবি। কিন্তু কোনও কিছুতে ওর মন বসল না। খোলা জানালাপথে বাইরে তাকাল... দুই চোখে ওর কোনও দৃশ্যই দাগ কাটে না। মায়ের চোখের জল আর বাবার গম্ভীর মুখ ওর সব আনন্দ কেড়ে নিয়েছে।

–আজ কেন বৃষ্টি হবে বাবা? কাল বৃষ্টি হলে কী ক্ষতি হত?

বাবা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে সরকারি কাগজে চোখ বোলাচ্ছিলেন। একটু বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলেন– আজকে বৃষ্টির প্রয়োজন তাই... বৃষ্টি হলে ঘাস, গাছপালা বেড়ে ওঠে ডিকি।

–কেন বাবা?

–গাছপালার ধর্ম বেড়ে ওঠা তাই।

ভ্রূ-দুটো চুলকে উঠল ডিকির। খসখস করে চুলকে নিয়ে প্রশ্ন করল– আচ্ছা বাবা, গাছপালা সব সবুজ হয় কেন?

--কেন হয়, কেউ জানে না... সবুজ সবুজ হয়। এত কেন কেন করো কেন? সব কেন'র কি জবাব হয়? বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলেন বাবা।

দিনের শেষে জন্মদিনের উৎসব শুরু হল। হাসি হাসি মুখে মা ওর হাতে উপহারের বাক্স তুলে দিলেন। বাবা কত আদর করলেন... ডিকি-ও আনন্দে উচ্ছল হয়ে মা'র দু'গালে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল। জন্মদিনের প্রকাণ্ড কেক কেটে উৎসবের সমাপ্তি ঘটল। খুশিতে ডগোমগো ডিকির দুই চোখের তারায় তারায় তৃপ্তির আভাস।

একঘণ্টা পরে আবার জানালার ধারে বসল ডিকি। সামনে আকাশের বুকে রাশি রাশি মেঘের পাহাড়। পাহাড় ফুড়ে আলোর তির বেরিয়ে আসছে এখানে সেখানে। ভারী সুন্দর লাগে ডিকির।

–বাবা, সূর্য কতদূরে আছে? আবার প্রশ্ন করে ডিকি।

–হাজার পাঁচেক মাইল হবে। প্রত্যয়ের সঙ্গে জবাব দিলেন বাবা।

...কয়েকদিন পর সকালে আবার সেই প্রাতঃরাশের টেবিল। মায়ের দু'চোখে জল। পরীক্ষার সঙ্গে চোখের জলের কী সম্পর্ক থাকতে পারে সেটাই ওর কাছে বোধগম্য হল না। বাবা নিজেই এবার পরীক্ষার কথাটা তুললেন।

–ডিকি... আজ তোমার পরীক্ষার দিন। অসম্ভব গম্ভীর বাবার কণ্ঠস্বর।

–আমি জানি বাবা। আমি আশা করছি....

–না না, চিন্তার কোনও কারণ নেই। প্রতিদিন হাজার হাজার ছেলেমেয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে। সরকার শুধু জানতে চায় ছেলেমেয়েরা কত স্মার্ট। ব্যস... শুধু এইটুকু মাত্র।

–আমি তো স্কুলে খুব ভালো রেজাল্ট করি। তাহলে আমাকে কেন পরীক্ষা দিতে হবে?

--এ একেবারে আলাদা পরীক্ষা। পরীক্ষার আগে ওরা এক কাপ কিছু একটা খেতে দেবে... তারপর ওরা একটা ঘরে নিয়ে যাবে... প্রকাণ্ড মেশিনের সামনে বসিয়ে দেবে। আর...

–কী খেতে দেবে বাবা?

–খুবই সাধারণ, কিন্তু দারুণ পিপারমেন্টের গন্ধ... আর এই পানীয়টাই তোমাকে প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে সাহায্য করবে। তা বলে মনে কোরো না যে, সরকার তোমাদের অবিশ্বাস করে... তবে এ সিদ্ধান্ত কম্পিউটারের।

ডিকির চোখেমুখে হতবুব্বি আভাস... অজানা আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে উঠল। মায়ের দিকে তাকাতেই সজোরে তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন মা। মায়ের বুকের মধ্যে রাশি রাশি আশ্বাস যেন খুঁজে পেল ডিকি।

–ছিঃ! কী বোকা ছেলে। ভয় কীসের... সবাইকে পরীক্ষা দিতে হয়। আমাদেরও দিতে হয়েছিল।

–তুমি ঠিক বলেছ। ঘাবড়াবার কী আছে? আর ডিকি তুমি তো ভালো ছেলে। দেখো, দারুণ ভালো রেজাল্ট করবে। তারপর বাড়ি ফিরে সারারাত গান শুনব, সিনেমা দেখব, গল্প বলব- বাবার কণ্ঠস্বরে কেমন যেন কৃত্রিমতার আভাস।

--ঠিক আছে.. আর ভয় পাবো না বাবা।

...নির্ধারিত সময়ের ঠিক পনেরো মিনিট আগেই ওরা পৌঁছে গেল। সরকারি শিক্ষা মন্দির। প্রকাণ্ড এক প্রাসাদের মতো বাড়ি। মার্বেলের করিডোর পেরিয়ে কারুকার্যময় এক তোরণের মধ্য দিয়ে ওরা সোজা চলে এল স্বয়ংক্রিয় এলিভেটারের সামনে। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে

গেল। ওরা প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে ওদের পাঁচতলায় পৌঁছে দিল সেটা।

সামনেই সাদা ইউনিফর্ম পরিহিত এক যুবক বসে। সামনে চকচকে টেবিল। ঘরের নম্বর ৪০৪। সব খুঁটিয়ে দেখল ডিকি। লিস্টে নাম মিলিয়ে ওদেরকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল যুবকটি।

কী ঠান্ডা ঘর। বিশাল ধাতব টেবিলের সামনে সার সার বেঞ্চ। অনেকটা বিচারালয়ের মতো। দু'চোখে একরাশ বিস্ময় নিয়ে দেখে ডিকি। টেবিলের সামনে বেশ কয়েকজন পিতাপুত্র চুপচাপ বসে। ক্ষীণদেহী এক মহিলা দ্রুত পায়ে ফাইল হাতে নিয়ে ক্ষণে ক্ষণে আসছে আর বাইরে যাচ্ছে।

মি. জর্ডান ফর্ম ভরতি করে সই করে দিলেন। ক্ষীণাঙ্গী ফর্ম নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

–দেরি হবে না তোমার নাম ধরে ডাকলেই দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে যাবে। ভয়ের কিছু নেই। ঘরের লোক সব বুঝিয়ে দেবে। পুত্রকে আবার আস্বস্ত করলেন বাবা।

গোপনে লাউডস্পীকারে একজনের নাম শোনা গেল। ডিকির সামনে বসা ছেলেটি বাবার পাশ থেকে উঠে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। ডিকির যেন মনে হল ছেলেটা দারুণ ভয় পেয়েছে।

এগারোটা বাজতে যখন পাঁচ মিনিট বাকি তখন ডিকির নাম ভেসে এল।

–নিশ্চয় ভালো হবে... কিছু ভেবো না... আমি এখানেই থাকব... শেষ হলেই ওরা আমাকে ডেকে নেবে! ছেলের দিকে না তাকিয়ে যন্ত্রের মতো বলে গেলেন বাবা।

ডিকি দুরু দুরু বুকে ঘরে ঢুকল। আবছা আলোয় ভালো করে দেখা যায় না। সামনেই ধূসর ইউনিফর্ম পরা একজন কথা বলে উঠল।

--বসো–এখানে বসো। কী মধুর কণ্ঠস্বর। ডিকি যেন অনেক সাহস ফিরে পেল।

–তোমার নাম রিচার্ড জর্ডন?

–হ্যাঁ স্যার। –তোমার নম্বর হল ৬০০-১১৫। নাও... এটা খেয়ে নাও... দেখ কী সুন্দর টেস্ট। টেবিলের ওপর থেকে একটা প্লাস্টিকের কাপ তুলে নিয়ে ডিকির দিকে এগিয়ে দিল সে। পানীয়টা অনেকটা ঘোলের মতো... তবে গাঢ়.. কেমন যেন পিপারমেন্টের স্বাদ। ঢক ঢক করে কাপটা শেষ করে ফেলল ডিকি।

--ঠিক আছে... আমার সঙ্গে এস।

ওর সঙ্গে ডিকি ঘরের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল। সামনেই একটা কাঠের চেয়ার... চেয়ারে বসার সঙ্গে সঙ্গে মাইক্রোফোনটা ডিকির মুখের সামনে চলে এল।

–এবার হেলান দিয়ে বসো। তোমাকে কতকগুলো প্রশ্ন করা হবে... বেশ ভালো করে চিন্তা করে উত্তর দিও। বাকি কাজ কম্পিউটার নিজেই করে নেবে।

--ঠিক আছে স্যার।

–সব বুঝেছ তো... আমি এবার চলে যাব... তুমি তৈরি হলেই যন্ত্রকে বলে দেবে... রেডি– ব্যস... বুঝেছ?

–হ্যাঁ স্যার।

ডিকির দুই কাঁধ টিপে ধরে আশ্বস্ত করে চলে গেল সে।

ডিকিও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল– রেডি।

পটপট করে কম্পিউটারে আলো জ্বলে উঠল। একরাশ গুঞ্জন শোনা গেল। পরক্ষণেই গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

–এর পরের সংখ্যা বলো– এক, চার, সাত, দশ...

...জর্ডান দম্পতি শোবার ঘরে মুখোমুখি বসে। কারুর মুখে কোনও কথা নেই। নির্বাক নিশ্চল।

প্রায় চারটে বাজে, টেলিফোন বেজে উঠল। স্প্রিং-এর এর মতো লাফিয়ে টেলিফোনটা ধরবার চেষ্টা করলেন শ্রীমতি জর্ডান। কিন্তু ততক্ষণে স্বামী টেলিফোন তুলে নিয়েছেন।

–মি. জর্ডান? খুব ধীর-স্থির কণ্ঠস্বর।

–হ্যাঁ, কথা বলছি।

সরকারি শিক্ষামন্দির থেকে বলছি। আপনার ছেলে রিচার্ড জর্ডান ক্লাসিফিকেশান ৬০০-১১৫ সরকারি পরীক্ষা শেষ করেছে। দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি আপনার ছেলের আইকিউ সরকার নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। আপনারা নিশ্চয় জানেন যে, নিউ কোডের ৫নং ধারার ৮৪ নম্বর উপধারা অনুযায়ী বেশি আইকিউ সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর... এরাই প্রচলিত সমাজ এবং শাসন ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটায়...

মায়ের বুকফাটা আর্ত চিৎকারে ছোট ঘর যেন ফেটে গেল... বাবার দু'চোখে টলটলে জল।

-রিচার্ড জর্ডানের মৃতদেহ কি আপনারা-ই সৎকার করবেন না সরকার সকারের ভার নেবে... যেমন জানাবেন সেইমতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সরকারি সকারের খরচ পড়বে এক ডলার মাত্র।

বিষের পেয়ালা – লি কিলাও

চন্দন্নার উত্তর মেরুপ্রদেশে ইরাস্কো শাটল ভেঙে পড়ায় প্রচুর ক্ষতি হয়। অসংখ্য চ প্রাণহানি ঘটে। এর ঠিক দু'দিনের মাথায় দুর্ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। খুবই দ্রুত বিচার নিষ্পত্তি হয়। বিচারের রায়ে বলা হল– শিল্পে গুপ্তচরবৃত্তিতে নিযুক্ত কারস মেরিভাল ব্যানটিং ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্ঘটনা ঘটানোয় বহুসংখ্যক লোক হতাহত হয়। বিচারে ব্যানটিং অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ায় জীবিত থাকার অধিকার হারিয়েছে। সে চন্দন্না সমাজে বসবাসের অযোগ্য বলে বিবেচিত হল। অতএব তিরিশ দিন ব্যানটিং নির্জন কারাগারে বন্দীজীবন কাটাবে এবং এই তিরিশ দিনের মধ্যে ব্যানটিংকে স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করতে হবে এবং জীবনের সবরকম লক্ষণ বিলুপ্ত হওয়ার পরই অপরাধীকে মৃত বলে ঘোষণা করে নশ্বর দেহের যথাযোগ্য সঙ্কার করা হবে।

তার মানে আমি নিজেকে হত্যা করব? আত্মহত্যা করব? চন্দন্নার আইনজীবীকে প্রশ্ন করলেন ব্যানটিং।

অন্যথায় আপনি নিজেকে অর্গান ব্যাঙ্কে দান করে দিতে পারেন। অবশ্য আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোনও প্রয়োজন আমাদের সমাজে নেই, তবুও আপনার উদার মনোভাবে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হবে। সব আইনজীবীদেরই এমনই সব কাটা কাটা ভাষা মনে মনে ভাবলেন ব্যানটিং।

আমি যদি বিষ পান করতে অস্বীকার করি? তখন কি জোর করে আমাকে গেলানো হবে?

ব্যানটিং-এর কথায় আইনজীবী শিউরে উঠলেন।

কিছু মনে করবেন না আপনার এই দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু আপনার সুস্থ মনোভাবের পরিচয় দেয় না। আর মনে রাখবেন যে, চন্দন্না রীতিমতো এক সভ্য গৃহ। আপনার শারীরিক অনিষ্ট করার জন্যে কেউই আপনার দেহ স্পর্শ করবে নয়া।

দরজা জানলায় ঘন আচ্ছাদন ছাড়া এই নির্জন সেল যেন রীতিমতো এক কামরা হোটেলের সুট। যেমন আরামদায়ক তেমনি নয়নমনোহর কারুকার্য করা। সময় কাটানোর জন্যে বেশ বড় লাইব্রেরি ছাড়াও রয়েছে মনোরঞ্জনের নানান আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম। তার ওপরে খাদ্যসামগ্রীর কোনও তুলনা হয় না। শুধু একটাই বিসদৃশ ব্যবস্থা মনকে উদ্বিগ্ন করে তোলে... ঘরের একপাশে পবিত্র বেদীর মতো টেবিলের ওপরে সুদৃশ্য এক কাপে টলটলে পীতাভ তরল পানীয়।

একসময়ে আইনজীবী সেল থেকে বেরিয়ে গেলেন। উঃ কী সব কথা... নিজে নিজে দেহত্যাগ করো... কে করছে দেহত্যাগ... বেশ মজা করে খাব আর শান্তিতে ঘুমোব। মনে মনে এমন সব ভাবছেন ব্যানটিং। আপিলে নিশ্চয় কিছু না কিছু হবে।

কিন্তু আপিল খারিজ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে রায় দানের তিরিশ দিনের মধ্যে আজ শেষ দিন। মনে মনে ব্যানটিং সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু শেষের দিনটা যথারীতি আগের দিনের মতোই শুরু হল। না... গুপ্তপথে কেউ বিষাক্ত গ্যাস ছাড়ল নয়া অথবা জোর করে গলার মধ্যে বিষও ঢেলে দিল। খাদ্যসামগ্রীর কোনওরকম পরিবর্তন-ও নজরে পড়ল না। সন্ধের সময়ে দিন পার করে দেবার খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠলেন ব্যানটিং। কেন জানি না মনে হল বিপদ কেটে গেছে। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাপভরতি পানীয়টা দূর করে দেওয়ালের গায়ে ছুঁড়ে

মারলেন তিনি... কাপটা ভেঙে খান খান হয়ে গেল। মসৃণ দেওয়াল বেয়ে নামল বিষের ধারা।

আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল। কিন্তু রাতের আহার আসতে দেরি হচ্ছে কেন? এর অনেক আগেই তো খাবার চলে আসে! পরপর আলোর সুইচ টিপলেন ব্যানটিং। আশ্চর্য! কোনও আলো জ্বলল না।

হঠাৎ দারুণ আতঙ্কে সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। হৃৎপিণ্ডটা কেউ যেন টিপে ধরল। দৌড়ে গিয়ে জলের কল খুললেন। কয়েক ফোঁটা জল টপ টপ করে পড়ে বন্ধ হয়ে গেল।

পাগলের মতো দরজার দিকে ছুটে গেলেন। মুহূর্মুহূ দরজায় করাঘাত করে চিৎকার করে উঠলেন– কে কোথায় আছেন... শুনুন... আমি আমার আইনজীবীর সঙ্গে দেখা করতে চাই... দরজাটা খুলুন একবার। কেউ সাড়া দিল না। কেউ এল না। বন্ধ দরজা বন্ধই রইল। বিচারকের রায়ের কথাগুলো আবার যেন শুনতে পেলেন ব্যানটিং। জীবনের সব লক্ষণ মুছে গেলে মৃত ঘোষণা করা হবে এবং যথাযোগ্য সকার হবে। অন্ধকারের মধ্যে চুরমার হয়ে যাওয়া কাপটাই এখন যেন একান্ত বন্ধু বলে মনে হল তার। দেওয়ালে শুকিয়ে যাওয়া বিয়ের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে রইলেন তিনি। ব্যানটিং-এর কণ্ঠ চিরে এক মর্মভেদী হাহাকার বেরিয়ে এল।

শিকারিরা – ওয়াল্ট সেল্ডন

যেমনটি শোনা গিয়েছিল ঠিক সেইভাবে স্পেসশিপ উপত্যকায় স্থিরভাবে দাঁড়িয়েছিল। যে শৈলশিরায় দাঁড়িয়ে লন আর জেনি স্বচক্ষে সব দেখল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে লন বলল, আমাদের যেতে হবে– দূরে, আরও দূরে পাহাড়গুলোর কাছে চারা ক্যানিওন যেতে হবে– এক খরস্রোতা নদী বয়ে চলেছে...

–চারা ক্যানিওনে-ও যখন ওরা পৌঁছে যাবে?

লন ওর দিকে ঘুরে দাঁড়াল। জেনির চোখ দুটো যেন না জ্বলা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ... ধূমায়িত... এখন জ্বলে ওঠেনি। অবশ্য কোনওদিনও জ্বলে ওঠেনি। এটাই জেনির স্বভাব... শুধু জেনি কেন, এটাই হল স্ত্রীজাতির আসল চরিত্র... ধীর স্থির... সর্বক্ষণ। পুরুষের পাশে পাশে। পুরুষেরা যে দিকে যায় নারীও সে দিকে অনুসরণ করে। জেনি লনের স্ত্রী। ছায়ার মতো। লনের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে... সেই যে ঝকঝকে শহরে আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ শুরু হল... দৈত্যাকার কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশপানে উঠে গেল, চারদিকে কেবল রাশি রাশি কাঠের টুকরো, বাড়ি ভাঙার ধ্বংসস্তূপ। নিধনযজ্ঞের পূর্ণাহুতি কবে হবে কে জানে?

ওরা একা নয়... কাতারে কাতারে মানুষ পাহাড় অভিমুখে ছুটেছে... এই মহাদেশের পাহাড়গুলোই হল মেরুদণ্ড। পলাতকরা দলবদ্ধ নয়... ছড়িয়ে ছিটিয়ে কেউ গেছে পাহাড়ি ঢালে, কেউ বা লুকিয়েছে গভীর সব গিরিখাদে। সেখানেই তারা পাথর কাঠ আর মাটি দিয়ে গড়ে তুলেছে ছোট ছোট কুঁড়েঘর।

–কী হল, কথা বলছ না কেন... চারাতেও যখন ওরা পৌঁছে যাবে?

দু'কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে রইল লন। বলার কিছু নেই।

নিচের উপত্যকায় কী যেন রোদের আলোয় চমকে উঠল। ঘন গাছপালার মধ্যে থেকে স্পষ্ট দেখা যায় না। মনে হয়, কয়েকশো গজ নিচে। গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখার চেষ্টা করল... চোখ কুঁচকে বেশ

কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পরে বোঝা গেল কয়েকটা অবয়ব খুব সন্তর্পণে উঠে আসছে। এইদিকে। হাতে ওদের বিচিত্র সব অস্ত্র... সেই অস্ত্রের ওপরে আলোর প্রতিফলনই ওর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে।

–জেনি... চলে এসো। চাপাস্বরে লন ডাকল।

–কোথায়? কেবিনে?

–না না–কেবিনের মায়া করলে হবে না... দু'একদিনের মধ্যেই ওরা হদিশ পেয়ে যাবে... চারা ক্যানিওন...

আবার শুরু হল পথচলা উত্তরদিকে। বারে বারে পেছন ফিরে উপত্যকায় দৃষ্টি রাখার চেষ্টা করল। বেশ কয়েকজনকে নজরে পড়ল। শুধু শহরেই নয়... অরণ্য উপত্যকাতেও ওরা ছড়িয়ে পড়েছে। ক্ষেপণাস্ত্রের মতো যানবাহন... ঠিক যেমনটি বেতার মারফত বারেবারে প্রচার করা হয়েছিল। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ হুবহু মিলে যাচ্ছে। একে একে সব ক'টা বেতারকেন্দ্র স্তব্ধ হয়ে গেল। শহরের পর শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল।

গিরিখাত বেয়েই ওরা চলছিল। নিবিড় গাছপালার মধ্যে অতি সন্তর্পণে মৃদুগতিতে ওরা পালাচ্ছিল... দূরে, আরও দূরে কোনও নিভৃত আশ্রয়ে। পত্রবহুল বৃক্ষশাখার আলো আঁধারির মধ্যে ওরা বিশ্রাম নেয়... আবার পথ চলে। দৌড়োয় না অথচ লম্বা লম্বা পা ফেলে। ওদের চলার মধ্যে কেমন যেন ছন্দ থাকে।

মাঝে মাঝে ওপরে নজর যায়... চাঁদোয়ার মতো নীলাকাশ। দূরে দূরে উপত্যকায় ওদের অবস্থিতি। দেখা না গেলেও লনের বুঝতে অসুবিধে হয় না। পশ্চিমের নিবিড় অরণ্যাবৃত বিস্তৃত মালভূমিও নিশ্চয় শত্রু-কবলিত। হঠাৎ অস্পষ্ট এক অজানা কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল লন। এ তো

সেই ভিনগ্রহীদের কণ্ঠস্বর। সোজা পথ ছেড়ে কোনাকুনি উঠে আসছে ক'জন।

আরও উত্তরে গভীর গিরিখাত বেয়ে লন আর জেনি আবার পাহাড়ের পাদমূলে নামতে শুরু করল। নিরবচ্ছিন্ন পর্বতমালা যেখানে বিচ্ছিন্ন হয়েছে সেই স্থান থেকে মাইল খানেকের মধ্যে রয়েছে চারা ক্যানিওন। দুর্ভেদ্য অরণ্যের সঙ্গে সমতলে ছোটবড় টিলার সমাবেশ। বেশ কয়েকবার অস্ত্র গর্জনের শব্দ শোনা গেল। পাহাড় অধ্যুষিত উপত্যকায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল সেই অনুরণন। ওদের পেছনে গিরিসঙ্কটের ওপর থেকেও একই শব্দ ভেসে আসছে। বুঝতে বাকি রইল না যে, শিকারিরা ওদেরকে অনুসরণ করে চলেছে।

ঢালের সর্বশেষ প্রান্তে পর্বতের পাদদেশে ওরা নেমে এল– সামনে এক জলবিহীন ক্ষীণ নদীখাত। লন এক লাফে অতিক্রম করে ওপার থেকে জেনির জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল। হাত ধরে লাফ দেবার সঙ্গে সঙ্গে হাত ফসকে জেনি মাটিতে পড়ে গেল। গোড়ালি মচকে গেল।

–উঃ মাগো!

–জেনি আর একটু কষ্ট করে চলো... আমাদের যে চারা ক্যানিওনের জঙ্গলে ঢুকতে হবে। স্ত্রীকে তাড়া দিল লন।

স্ত্রীর কটিদেশ বেষ্টন করে দ্রুত চলার চেষ্টা করল লন। মুখে না বললেও প্রতি পদক্ষেপেই জেনির মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত হচ্ছে। জেনি জানে থামলে চলবে না... যে কোনওরকমে যেতেই হবে... দূরে আরও দূরে।

বছরখানেক আগের কথা মনে পড়ে গেল। হানাদারদের প্লেন তখন দেখা গেছে... সংখ্যায় ওরা বেশি নয়। সঙ্গে সঙ্গে গুলি চলল... পরপর ক'টা প্লেন মুহূর্তের মধ্যে অগ্নিগোলকে রূপান্তরিত হয়ে সশব্দে ভেঙে

পড়ল শহরের ওপরে। রাশি রাশি ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশকে মলিন করে দিল। তখন জেনি বলছিল– আহা রে... হানাদার হলেও ওদেরও তো জীবন আছে.. কী নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হচ্ছে... ওদের জন্যে কষ্ট হয়।

এরপর হানাদারদের আক্রমণ আরও তীব্র হয়। লন তখন এক এয়ারক্রাফট কারখানায় কাজ করত। নিজেরও একটা ছোট প্লেন ছিল। একদিন সেই প্লেনেই রাতের বেলায় শহর। ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল ওরা... মাঝে জ্বলন্ত এক শহরে নেমে বেশ কিছুটা জ্বালানি চুরি করে আবার আকাশপথে উত্তরে উড়ে চলে তারা। কিন্তু ভাগ্য সহায় ছিল না। একদিন পাহাড়ের মাথায় প্লেনটা আছড়ে পড়ে। প্রাণে বেঁচে যায় ওরা। ভাঙা প্লেনের খণ্ডাংশ দিয়ে ওরা কেবিন তৈরি করে বসবাস শুরু করে। কিন্তু সেখানেও হানাদারদের সুতীক্ষ্ণ নজর এড়াল না।

গুলির শব্দে চিন্তার রেশ কেটে গেল ওদের। খুবই নিকটে শব্দের উৎস। সভয়ে পেছন ফিরে তাকাতেই সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেল। গিরিখাত বেয়ে হানাদাররা নেমে আসছে। সংখ্যায় ওরা অনেক। জেনিকে জোর করে টানতে টানতে বিশাল এক গাছের আড়ালে আত্মগোপন করল লন।

যন্ত্রণায় মুখ টিপে রইল জেন। ব্যথায় সমস্ত দেহ যেন ছটফট করে উঠল।

এবার দু'হাতে বুকের মধ্যে তাকে তুলে নিল লন। পরম মমতায় আশ্বস্ত করতে চাইল। ধীরে ধীরে গাছের তলায় জেনিকে নামিয়ে দিল লন। সেও পাশে বসে পড়ল। দুজনেই আতঙ্ক আর ক্লান্তিতে জেরবার। এরপর আর কী করার থাকতে পারে! গভীর আশ্লেষে দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরল। হৃদয়ে হৃদয়ে অব্যক্ত ভাব বিনিময় হল। চার চোখের

মিলনে একটা কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, আর ওদের চলার শক্তি নেই।

দূরে হানাদারদের কণ্ঠস্বর যেন কষাঘাত করছে বারে বারে। লনের শুষ্ক দুই ঠোঁট জেনির মুখমণ্ডল বারবার স্পর্শ করে আশ্বস্ত করার প্রয়াস করল। জেনির দু'গাল বেয়ে ঝরে পড়া অশ্রুধারা সযত্নে মুছিয়ে দিল লন। বিড়বিড় করে কত কথাই না বলে চলল... মুহূর্তের জন্যে হারিয়ে যাওয়া সুখের দিনের স্পর্শ পেতে চাইল ওরা।

–লন... আমার লন... আমরা দুজনে একসঙ্গে আছি... এর চেয়ে আর কিছু কামনা করি না। জেনির স্বরে পরম তৃপ্তির ছোঁয়াচ।

হানাদারদের পায়ের চাপে ঝোঁপঝাড় ভাঙার আওয়াজ উঠছে। আরও কাছে এগিয়ে আসছে তারা।

হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল লন। শব্দ লক্ষ্য করে কয়েক পা এগিয়ে গেল সামনের দিকে। দু'হাতের বজ্রমুষ্ঠি আর ইস্পাতের মতো টান টান সর্বাঙ্গে আত্মপ্রত্যয়ের এক নতুন মাত্রা যোগ হল। দু'চোখের তারায় তারায় অবিশ্বাস্য এক বিদ্রোহ যেন মূর্ত হয়ে উঠল।

–শয়তানের দল! আর পালাব না... এবার মুখোমুখি...। চিৎকার করে বলে উঠল লন।

–লন... আমার লন... এ উত্তেজনা তোমায় মানায় না। ভুলে যেও না ওরা হানাদার... শিকারি... মায়া, দয়া সভ্যতার দান... কিন্তু ওরা সভ্য নয়! আর সভ্য নয় বলেই ওরা বিনা কারণে নির্বিচারে হত্যা করে চলেছে... জেনির শান্ত কণ্ঠস্বরে ধিক্কার ধ্বনিত হয়ে উঠল।

ধীরে ধীরে এক শিকারি লনের সামনে এসে দাঁড়াল। লনের আপাদমস্তক বেশ কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করল... মাটিতে পড়ে থাকা জেনিকে বারেবারে লক্ষ করল। মনে হল শিকারি ভয় পেল আর

ভয়ের কারণেই আত্মরক্ষার অজুহাতে চকচকে অস্ত্র ওদের পানে বাগিয়ে ধরল।

ভয়শূন্য চিত্তে লন তাকিয়ে রইল হানাদারদের দিকে। খুব ভালো করে লক্ষ করল শিকারি হানাদারকে। এত কাছ থেকে ওদের দেখার সৌভাগ্য হয়নি ওর। এরাই তাহলে পৃথিবী নামক গ্রহের জীব... সূর্যের তৃতীয় গ্রহ–চাঁদ যার একমাত্র উপগ্রহ। এদেরই নাম মানুষ!

লনের পাশে জেনি উঠে দাঁড়াল। অপেক্ষা শুধু ফট ফট দুটো শব্দ... মানব সভ্যতার নিদর্শন।

ক্রিকেট বল – অ্যাভ্রো ম্যানহাটান।

এক ঝলক ফেরাস-লিকুইড ঝপ করে পড়ে গেল। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীভূত হতে শুরু করল এবং অচিরেই একটা ক্রিকেট বলের আকার নিল। চলমান বলের গতিবেগ হ্রাস পেলেও গড়াতে গড়াতে বলটা শেড পেরিয়ে একেবারে রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে গেল। বলটা গড়িয়ে আসার পথ বরাবর কংক্রিট-এর রাস্তাটা বেশ কয়েক ইঞ্চি বসে গেল। মনে হল বলটা নরম কাদার ওপর দিয়ে যেন গড়িয়ে এল।

প্রফেসর লে ঘড়ি দেখলেন। সময় এখন বিকেল ৩-৩৫ মি.। এতদিনের পরীক্ষা আজ সফল হল। সব উৎকণ্ঠার অবসান। এক নতুন বস্তুর জন্ম দিয়েছেন তিনি, যার আপেক্ষিক গুরুত্ব তখনও অজানা। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই বস্তুটাই এখন রাস্তার মাঝখানে।

–রাস্তার মাঝখানে কী এটা? প্রশ্ন করলেন পি. সি. জেল্ক।

ট্রাফিক পুলিশ এবং প্রফেসর স্বয়ং বলটার দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

এটা কী?–আরে সারাটা পথ যেন চষে এসেছে বলটা? আবার প্রশ্ন জেল্কের।

রুমাল দিয়ে বেশ কয়েকবার কপাল মুছে প্রফেসর বললেন- কিছু কিছু নক্ষত্রের অ্যাটমগুলো সঙ্কুচিত নিষ্পেষিত হয়ে ওঠার ফলে অ্যাটমসৃষ্ট বস্তুসমূহ অস্বাভাবিক ভারী হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ ধরুন ভ্যান মানেন নামক নক্ষত্রের বস্তুসমূহের ঘনত্ব জলের ঘনত্বের তুলনায় ৩০০,০০০ গুণ বেশি। অন্যভাবে বলা যে, আলপিনের মাথার আকার এমন ঘনত্বের কোনও বস্তু এত ভারী হবে যে, হাত দিয়ে ধরলে বুলেটের মতো হাতের তালু ভেদ করে পড়ে যাবে।

তাই নাকি? জেন্ধের মুখে অকৃত্রিম বিস্ময়। নিজের দুই হাতের তালু ভালো করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। ভাবলেন, এই হাত ফুটো করে বেরিয়ে যাবে!

কী জানি বাবা... এ কেমন বস্তু। আপনার ব্যাপার আপনিই ভালো জানেন প্রফেসর। এখন বলটাকে কারখানায় নিয়ে যান। যানবাহন বন্ধ হলে আর এক বিপদ হবে।

–বলছেন তো ঠিকই। কিন্তু আমি কি পারব? এবার নিচু হয়ে বলটা তোলবার চেষ্টা করলেন প্রফেসর। কিন্তু বলটা এক বিন্দু নড়ল না।

–কী হল? আটকে গেল নাকি? উদ্বিগ্ন হয়ে জেল্ক প্রশ্ন করলেন। কোনও উত্তর না পেয়ে সবুট এক লাথি কষালেন তিনি বলটার গায়ে। পরক্ষণে উঃ করে মাটিতে বসে পড়লেন। একটুও হেলল না বলটা, উপরন্তু পায়ের যন্ত্রণায় অস্থির জেল্ক।

গ্যারেজ থেকে ভ্যানগাড়িটা বার করল নবি ক্লার্ক। কিন্তু রাস্তা বন্ধ। ট্রাফিক পুলিশ জেল্ক ওর অনেক দিনের শত্রু। তাই ব্যঙ্গ করে সে বলে উঠল– কী হল? গাড়ি বন্ধ করে রাস্তায় ফুটবল খেলছেন নাকি?

ব্যঙ্গের ধার দিয়েও গেল না জেল্ক। বলল– না না, মাটির সঙ্গে আটকে গেছে।

এবার গাড়ি থেকে নামল ক্লার্ক। গজগজ করতে করতে পা দিয়ে সরাবার চেষ্টা করল বলটাকে। কিন্তু যে কে সেই!

–কী এটা? প্রফেসরের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুঁড়ল সে।

––কিছু না... একটা এক্সপেরিমেন্ট! আচ্ছা তোমার কাছে কোনও যন্ত্র আছে? কারখানায় বলটা তুলে নিয়ে যেতে হবে।

এবার ভ্যান থেকে সাত পাউন্ডের পেল্লায় এক হাতুড়ি বার করল ক্লার্ক। তারপরে গায়ের জোরে হাতুড়ি-পেটা করল বলটাকে। প্রচণ্ড ধাক্কায় হাত থেকে হাতুড়ি ছিটকে গেল। ক্লার্কও আর্তনাদ করে দুই হাতের আঙুল চেপে রাস্তায় বসে পড়ল।

–অপূর্ব! এই হাতুড়ির ঘাটাই অন্তত তিনশো পাউন্ডকে নাড়াতে পারত। দারুণ ব্যাপার! বলটার ওজন বেশ ভালোই হবে! উৎফুল্ল প্রফেসর উত্তেজনায় অধীর।

জেল্ক এবার দমকলকে খবর দিলেন। দমকলবাহিনী বলটার চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখল। যে কোনও পরিস্থিতিতে উদ্ধার করাটাই ওদের কাজ। তাদের দড়ি দিয়ে সে বলটাকে বাঁধল ভালো করে। তারপর দড়ির অপরপ্রান্তটা দমকলের গাড়ির সঙ্গে আটকে দিল। ড্রাইভার ফার্স্ট গিয়ার দিয়ে ইঞ্জিন স্টার্ট করল। গাড়ি এক চুল নড়ল না... এক মিনিটের মধ্যে তারের দড়িটা পটাং করে ছিঁড়ে গেল। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে বেশ কিছুটা সামনে ছুটে গেল গাড়িটা।

এবার এক পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়াল। গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামল ইউনিফর্ম পরা চারজন পুলিশ। কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্ত রাস্তাটা ঘিরে ফেলল। তারপর বলটাকে মোটা জালের ঘেরাটোপ দিয়ে আটকে রাখল। তৎক্ষণাৎ প্রধানমন্ত্রীর কাছে বার্তা পৌঁছে গেল। খবরের কাগজেও সযত্নে মেপে মেপে সংবাদ পাঠানো হল। এর পরেই

সৈন্যবিভাগ সম্পূর্ণ জায়গাটাতেই জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ বোর্ড টাঙিয়ে দিল। অবশ্য সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে ঘোষণা করা হল যে, ভয়ের কোনও কারণ নেই... তেজক্রিয়তার কোনও নিদর্শন এখনও পর্যন্ত ধরা পড়েনি।

বেশ কিছুক্ষণ পরে সৈন্যবিভাগের তিনজন উচ্চপদস্থ অফিসার সরেজমিনে এলেন। ওম্যান ইনস্টিটিউড থেকে চায়ের আসরে জেনারেল বললেন– প্রফেসর লে... এমনভাবে পাবলিসিটি করার কীসের প্রয়োজন ছিল? জনসাধারণের কত অসুবিধে হচ্ছে।

–পাবলিসিটির কোনও ব্যাপার নয়। বলটা হঠাৎই গড়িয়ে কারখানার বাইরে চলে এল। মানে, হঠাৎ অতিরিক্ত কোনও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আকর্ষণেই বলটা গড়াল। অনেক চেষ্টা করেও থামাতে পারিনি। তবে আমি বলি...

কথা শেষ হবার আগেই চিৎকার করে উঠলেন জেনারেল ট্যাঙ্ক ক্রেন। ট্যাঙ্ক ক্রেন নিয়ে এসো। জলদি!

বলটাকে বেশ ভালো করে বাঁধতে ক্রেনের লোকজনদের বেশ কিছুক্ষণ লাগল। বলটার চারপাশে কংক্রিট খুঁড়ে গর্তটা আরও বড় করার সঙ্গে সঙ্গে বলটা আরও গভীরে নেমে গেল। তা সত্ত্বেও বেশ পোক্ত করে সেটাকে বেঁধে ফেলা হল।

এবার ক্রেনের ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল। ক্রেনের লোহার দড়িতে টান ধরল। ফার্স্ট গিয়ার, সেকেন্ড গিয়ার... থার্ড গিয়ার দেবার সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিন বিকট আর্তনাদ করে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। এক ইঞ্চিও বলটাকে নাড়ানো গেল না।

–আরও... আরও জোরে অ্যাক্সিলেটার চাপো। চাপাস্বরে গর্জন করে উঠলেন জেনারেল।

ব্যস! দুম করে চেনটা ছিঁড়ে গেল এবং ক্রেনের ইঞ্জিনটাও সামনে উলটে গেল। তৎক্ষণাৎ অ্যালডারসটে লোক ছুটল... ক্রেনটাকে তোলার জন্যে আর একটা ভারী ক্রেন চাই। বলটাকে সরানো এবং ক্রেনটাকে উদ্ধার করার জন্যে মিলিটারি কর্তারা প্রচণ্ড তৎপর হয়ে উঠলেন। সামান্য বলটাকে হটাতে না পারলে পুরো মিলিটারির বদনাম। জনসাধারণ কী ভাববে!

পরের দিন ভোরে সব খবরের কাগজেই বড় বড় করে সরকারের অপদার্থতার কথা ফলাও করে ছাপা হল। প্রফেসর লে আর তার যুগান্তকারী অবদানের ভূয়সী প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভূত সমস্যার আশু সমাধানও দাবি করা হল। এর ফলে জনগণ আতঙ্কে অধীর হয়ে উঠল। আশু কর্তব্য জানার জন্যে কাতারে কাতারে জনতা ভিড় জমাল প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির সামনে। সকলের একই কথা... সমাধান চাই... এক্ষুণি চাই। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর কাছেও জরুরি বার্তা গেল। মাটির গভীরে নাচতে নাচতে বলটা যদি পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু ভেদ করে অস্ট্রেলিয়ায় আত্মপ্রকাশ করে তাহলে যেন যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কারণ যে মাঠে অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ডের ফোর্থ টেস্ট চলবে ঠিক সেইখানেই বলটি মাটি খুঁড়ে বেরিয়ে আসার কথা।

জনতাকে শান্ত করার জন্যে খোদ প্রধানমন্ত্রীকেই বারবার নিজের প্রাসাদের বাইরে এসে জনতার উদ্দেশে ভিক্টরি চিহ্ন দেখাতে হয়েছে। কিন্তু বলটাকে তুলে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাবার মতো কোনও সমাধানসূত্র এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

দুপুরবেলায় আরও এক নাটকীয় ঘটনা ঘটল। বিরোধী দলের মধ্যে কট্টর গোঁড়ারা দাবি করল যে, এক্ষুণি বলটাকে লক্ষ করে হাইড্রোজেন

বোমা নিক্ষেপ করা হোক। আর তা না হলে বর্তমান সরকার পদত্যাগ করুন।

এইবার গ্রীনহ্যান কমন থেকে আমেরিকায় বায়ুসেনার বিশাল বিমান উড়ে এল। সঙ্গে নিয়ে এল ২৫০ টনের বিশাল এক ক্রেন। ২৫০ টন যদি অকৃতকার্য হয় তাহলে কয়েকদিনের মধ্যে ৫০০ টনের ক্রেন তৈরি হয়ে যাবে।

দ্বিপ্রহরের খাওয়ার পরেই প্রধানমন্ত্রী নিজের বাসগৃহ ছেড়ে সোজা চলে এলেন সমস্যার মূল কেন্দ্রে। সরেজমিনে দেখা এবং সকলের মনে সাহস জুগিয়ে সমাধান করাটাই আসল কাজ। দুই আঙুলে চিহ্নের মাঝে পিং পং-এর বল আটকে অবশ্যম্ভাবী জয়ের বার্তা পৌঁছে দিলেন। অকুস্থলে ইতিমধ্যে অস্থায়ী রেললাইন, নানান আকারের ক্রেন, দমকলের গাড়ি, মিলিটারি জিপ, ট্যাঙ্ক আর উদ্বিগ্ন মুখে অসংখ্য জনগণ গিজগিজ করছে। অনেক কষ্টে এবং অগুনতি লোকের সাহায্যে প্রধানমন্ত্রী বলের কাছে গিয়ে পৌঁছোলেন।

–এমনটা যে হবে একেবারেই বুঝতে পারিনি স্যার। ওঃ, আপনার অমূল্য সময়ের কী ভয়ঙ্কর অপচয়। দারুণ মিনতি মাখানো সুরে কথাগুলো বললেন প্রফেসর।

কোনও কথা না বলে শুধু ক্ষমাসুন্দর চোখে প্রফেসরের দিকে তিনি তাকালেন একবার। তারপর বলের দিকে তাকালেন...

...দড়ি চেন লোহার শেকল ঘষে ঘষে দারুণ মসৃণ আর চকচকে হয়ে উঠেছে বলটা। ওঃ, সামান্য একটা বল নিয়ে কী কাণ্ডটাই না হচ্ছে! রাগে গড়গড় করে উঠল প্রধানমন্ত্রীর সর্বাঙ্গ। হাতের ছড়িটা দিয়ে সজোরে এক খোঁচা মারলেন। আশ্চর্য! এক খোঁচাতেই গর্ত ছেড়ে

লাফিয়ে উঠল বলটা... আপন মনে গড়িয়ে গড়িয়ে রাস্তার ধারে নর্দমার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

হো হো করে হেসে উঠলেন প্রফেসর। হাতের ঘড়িটার দিকে তাকালেন। ঠিক এখন দুপুর ৩টে বেজে ৩৩ মিনিট।

–আমার অনেক আগেই এটা ভাবা উচিত ছিল। এটা আনস্টেবল কম্পাউন্ড। এর মলিকিউলার গঠনপ্রকৃতি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ভেঙে যায়। তাহলে এখন তো আর কোনও সমস্যাই নেই!

যেমন কথা তেমন কাজ। বলটা তুলে নিয়ে বেমালুম পকেটে পুরে নিলেন প্রফেসর।

–বুঝলেন স্যার... বিজ্ঞানীর কাজের কোনও শেষ নেই... দেখুন না এখনই আবার এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে! কথা শেষ করে কারখানায় ঢুকে মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ করে দিলেন প্রফেসর।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট – এরিফ ফ্র্যাঙ্ক রাসেল

পেশিবহুল দীর্ঘদেহ, ঠিক যেন জাঁদরেল কুস্তিগির। বাঘের মতো সাহসী দুর্ধর্ষ। দারুণ পে কর্মব্যস্ত তাঁর জীবন... অলসতা দু'চক্ষের বিষ। অন্ধকার জগতের একচ্ছত্র অধিপতি, যাঁর ঘণ্টা-প্রতি মূল্য কয়েক হাজার মুদ্রা। ওঁর চেয়ে দামি ব্যক্তি আর যে কেউ হতে পারে এমনটি মনে হয় না।

হ্যাঁ... ওঁর নাম হেনরি কারান।

অপরাধের কি বিচার হয় না?

জঙ্গলের রাজত্বে অবশ্যই হয় না। আর বিরোধীদলকে কজা করা তা যেমন করেই হোক না কেন সেই হল নিয়ম। কিন্তু এর শেষ কোথায়?

প্রকাণ্ড বড় সাজানো-গোছানো অফিসে দরজা ঠেলে ঢুকলেন কারান। টুপিটা স্ট্যান্ডে রেখেই বিশাল টেবিলের একপাশে প্রকাণ্ড চেয়ারে বসে পড়লেন। সামনে সুদৃশ্য দেওয়াল ঘড়ি। সময় এখন বারোটা বাজতে ঠিক দশ মিনিট বাকি।

চেয়ারে হেলান দিয়ে সামনের দরজার দিকে চেয়ে রইলেন। দশ সেকেন্ড চলে গেল। অধৈর্য কারান টেবিলের পাশে অনেকগুলো বোতামের মধ্যে লাল বোতামটা সজোরে টিপে ধরলেন। হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন মিস রীড।

–বলি, ব্যাপারটা কী? দিনে দিনে দেখি অধঃপতনই হচ্ছে। রাতারাতি বয়সটা বেড়ে গেল না কিছু মতলব আছে? প্রশ্নের ঝড় তুললেন কারান। ক্ষেপে উঠলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না তাঁর।

দীর্ঘাঙ্গিনী সুন্দর মুখশ্রীসম্পন্না যুবতী মিস রীড। পরিধেয় বস্ত্রেও সুরুচির পরিচয়। মুখমণ্ডল জুড়ে অজানা আতঙ্ক। এইরকম নম্র স্বভাবেরই কদর করেন কারান।

–দুঃখিত স্যার। আমি...

ব্যস ব্যস! অজুহাত দিয়ে লাভ হবে না। চলাফেরা কথাবার্তায় গতি চাই... বুঝলে,–গতি! চটপটে না হলে জীবনে কিছুই হবে না। বুঝলে?

–আপনি ঠিকই বলেছেন স্যার।

–ল-লোর্দোকি কি ফোন করেছিল?

–না স্যার।

–ধরা না পড়লে ও এতক্ষণে ডেঞ্জার-জোন পেরিয়ে গেছে। আবার ঘড়ির দিকে তাকালেন... অসহিষ্ণু হাতে টেবিলে টরেটক্কা বাজাতে শুরু করলেন।

–কিন্তু ও যদি উলটোপালটা করে... তখন কেউ ওকে বাঁচাতে পারবে না... হ্যাঁ হ্যাঁ ফোন করলে বলে দিও... আমি কিন্তু কোনও রিস্ক নেব না... বুঝলে... একবার জেল খাটলে বুঝতে পারবে কত ধানে কত চাল! আপন মনে গজগজ করতে লাগলেন কারান।

--ঠিক আছে স্যার... ফোন এলেই বলে দেব। কিন্তু এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক...

--একদম চুপ করে থাকবে! বলেছি না যখন আমি কথা বলব... তুমি কথা বলবে না। হ্যাঁ শোনো, মাইকেলসন ফোন করলে বলবে ফায়ারফ্লাই উড়ে গেছে... সঙ্গে সঙ্গে ভসকে ফোন করে জানাবে... এক মুহূর্তও যেন ওর দেরি না হয়।.. কী, শুনছ? নাকি অন্যদিকে মন পড়ে আছে? মনে থাকবে তো? এক সেকেন্ডও যেন দেরি না হয়। একনাগাড়ে গজগজ করে চলেছেন কারান।

–উঃ কী যে করি... বারোটা কুড়িতে মিটিং আছে, খুব জরুরি... যেতেও হবে অনেক পথ। কতক্ষণ যে চলবে কে জানে! শোনো, আমার কথা জিজ্ঞেস করলে সটান বলে দেবে তুমি জানো না... কখন ফিরব বা ফিরব না তাও জানো না। কী, মনে থাকবে তো? কী হল, কথার উত্তর দিচ্ছ না যে! তবে জেনে রাখো ফিরতে ফিরতে আমার চারটে বেজে যাবে। বুঝলে?

–বুঝেছি। কিন্তু স্যার...

–ভালো করে বুঝেছ... চারটের আগে কেউ আমার দেখা পাবে না!

–স্যার এক ভদ্রলোক যে বসে আছেন... উনি বললেন যে, আপনার সঙ্গে নাকি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে ঠিক বারোটা বাজতে দু'মিনিটে।

–কীসব বকছ পাগলের মতো? তোমার হয়েছেটা কী? ধমকে উঠলেন কারান। একটু শুনুন– উনি যা বলেছেন আমি শুধু সেইটুকুই বলেছি। ভদ্রলোকের কথাবার্তায় খুব সিরিয়াস মনে হয়েছে স্যার।

–হুঁ, কথা শুনেই সব বুঝে গেলে? সিরিয়াস! সব ভেক্ ভেক্.. দেখো ভালো করে, হয়তো ভুল ঠিকানায় এসেছে। তা নয়ত সোজা পথ দেখতে বলো!

–তাহলে সবটা শুনুন স্যার। আমি বলেছি আপনি অফিসে নেই। অনেকক্ষণ বেরিয়ে গেছেন... ফেরার কোনও ঠিক নেই। সব শুনে ভদ্রলোক চেয়ার টেনে বসলেন। বললেন, আমি অপেক্ষা করছি... আপনি নাকি ঠিক বারোটা বাজতে দু'মিনিট আগেই ফিরবেন।

নিজেদের অজান্তেই দুজনে ঘড়ির দিকে তাকালেন। কারান নিজের হাতঘড়িটা চোখের সামনে মেলে ধরলেন। না... দুটো ঘড়ি একই বলছে...

–শোনো... ভদ্রলোককে বিদায় করো! নিজে থেকে না গেলে বলো, দারোয়ান দিয়ে বের করে দিতে হবে?

–না স্যার... দারোয়ানের দরকার হবে না... ভদ্রলোক বৃদ্ধ তারপরে দৃষ্টিশক্তিহীন... অন্ধ!

–বৃদ্ধ আর অন্ধ হলেই বা আমার করার কী আছে... এর পরে হাত-পা থাকলেও আমার যে কথা সে কাজ। যাও যাও... বার করে দাও।

মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন রীড। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যে এক অদ্ভুত মুখে ফিরে এলেন।

–না স্যার পারলাম না। উনি বারবার করে বলছেন আজকের দিনটা নাকি অনেক দিন আগেই ঠিক করা ছিল... ঠিক বারোটা বাজতে দু'মিনিটে। ব্যক্তিগত এক জরুরি বিষয়েই আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে উঠল কারানের মুখমণ্ডল। বড় বড় চোখ করে ঘড়ির দিকে চেয়ে রইলেন তিনি কয়েক মুহূর্ত। ঘড়ির কাঁটা এখন বারোটা বাজতে ঠিক চার মিনিট। ব্যঙ্গের সুরে বলে উঠলেন– অন্ধ লোক! আমি কোনও অন্ধ লোককে চিনি না... আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকলে আমি ভুলি না... যাও যাও, কথা না বাড়িয়ে হাত ধরে পথে নামিয়ে দাও।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় রীড কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। স্যার একবার না হয়...

–না না না! এক্ষুণি ওকে বার করে দাও!

–স্যার... হয়তো আপনার নিকটজন ওঁকে পাঠিয়েছেন... কথা বললে হয়তো বুঝতে পারবেন।

একটু চিন্তা করে বললেন– তা হতে পারে... এতক্ষণে তোমার ব্রেন কাজ করছে। দেখছি। যাক, ভদ্রলোকের নাম কী?

–নাম বলছেন না!

–কী কাজ তাও বলছেন না?

–হুম! বেশ ঠিক দু'মিনিট সময় দিচ্ছি। দান-খয়রাত চাইলে সটান জানালা দিয়ে ফেলে দেব, মনে থাকে যেন। অযথা সময় নষ্ট করতে বারণ করো। যাও নিয়ে এসো।

রীড ভদ্রলোককে নিয়ে এলেন... একটা চেয়ার টেনে বসতে বললেন। পরে দরজা বন্ধ করে বাইরে চলে গেলেন। ঘড়িতে বারোটা বাজতে ঠিক তিন মিনিট বাকি।

...কারান খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভদ্রলোকের আপাদমস্তক দেখলেন বারবার। সচরাচর এমন লম্বা-চওড়া লোক দেখা যায় না, একমাথা ধবধবে সাদা চুল। সর্বাঙ্গে ঢিলেঢালা কালো অঙ্গরাখা... সমস্ত মুখমণ্ডল জুড়ে কেমন যেন অস্বাভাবিক দ্যুতি। চক্ষুবিহীন অক্ষিকোটর-দুটি দারুণ বাঙময়। দৃষ্টিহীন চোখ দুটো যেন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির চেয়েও অনেক বেশি প্রাণবন্ত। অন্ধ চাহনিতে হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্যন্ত যেন ছবি তুলে নেয়... এ কী চোখ... এ যে দৃষ্টিমানদের চেয়েও অনেক তীক্ষ্ণ! কেমন যেন শিহরণ বয়ে গেল সর্বাঙ্গে। কালো কালো অক্ষিকোটর দুটি যেন ব্যঙ্গ করে উঠল।

জীবনে এই প্রথম ভয় পেলেন কারান।

--বলুন, আপনার জন্যে কী করতে পারি?

--কিছু না... কোনও কিছু করারই প্রয়োজন নেই! কী গম্ভীর কণ্ঠস্বর! নিচুস্বরে কথা বললেন, যেন গমগম করে উঠল সমস্ত ঘর। নিস্পৃহ নির্মোহ কণ্ঠস্বর। পৃথিবীর অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত। স্থির হয়ে চেয়ারে বসে মণিহীন অক্ষিকোটর দুটি কারানের ওপরে নিবদ্ধ। কী শীতল বরফকঠিন সান্নিধ্য। অজানা আতঙ্কে কারানের সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে নড়েচড়ে বসলেন তিনি। ক্রোধে সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল।

–দেখুন, অযথা আমার সময় নষ্ট করবেন না... আপনার কী প্রয়োজন বলে ফেলুন চট করে, আর না হলে পথ দেখুন!

–ভুল করছেন! সময়টা আপনার নয় বরং এই সময়-ই আপনাকে টেনে নিয়ে যায়।

–কী বলতে চাইছেন? হেঁয়ালি ছেড়ে কাজের কথায় আসুন। কে আপনি? কী আপনার পরিচয়?

--আমাকে আপনি চেনেন... সকলেই আমাকে চেনে। প্রত্যেকেই নিজেকে সূর্যের মতো শক্তিশালী ভাবে, কিন্তু কালো মেঘও সূর্যকে ঢেকে দেয়... আবার সূর্যও তো অক্ষয় অমর হয়। সময় হলে...

হিমশীতল স্রোতের মুখে কারান যেন নিষ্প্রভ শক্তিহীন।

–এত হেঁয়ালি কেন? পাগলের মতো কথা বলছেন!

–না... হেঁয়ালি বা পাগলামি করছি না। কণ্ঠস্বরে লৌহকঠিন প্রত্যয়ের সুর। হঠাৎ কারানের মস্তিষ্কে যেন বিস্ফোরণ হল। ক্রোধে জ্বলে উঠল দুই চোখ। টেবিল চাপড়ে চিৎকার করে উঠলেন– চুপ। পাগলামি বন্ধ করুন! সোজা কথায় বলুন কী চান আপনি?

স্থান-কাল-পাত্র যেন বিলীন হয়ে গেল। ক্রমেই অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল। দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বেধহীন অবয়বশূন্য মহাকালের অসীম হাত এগিয়ে এল কারানের দিকে। মৃত্যুর মুখে উচ্চারিত হল... তোমাকে!

মৃত্যু কারানকে নিয়ে গেল মহাকালের কোলে।

ঘড়িতে তখন বারোটা বাজতে ঠিক দু'মিনিট বাকি!